বনতুলসী

প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল

বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক :

বিশ্ববাণীর পক্ষে

শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডল

১১এ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা-৭

মুদ্রক :

শ্রীমোদনারাণ দাস

মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড,

১১৪।১১৬, বলরাম দে ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

মোহন প্রেস

বাইণ্ডার্স

জাগ্রত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

তিন টাকা আট আনা

পাঠকসমাজে সুন্দর ও সুষ্ঠু সাহিত্য পরিবেশন করাই প্রকাশকের পুণ্যকর্তব্য। নতুনই সুন্দর নয়। নতুনের উন্মাদনা আছে নিঃসন্দেহ। তাই বলে পুরানো সব কিছু বাতিল করা যায় না। বিশেষ, যেখানে পুরোনোর মাঝে নতুনের রস পাই। যেখানে পুরোনোর মাঝে সত্যের স্বাক্ষর পাই। যেখানে বিদায়ের মাঝেও আগমনীর সুর শুনতে পাই।

বনতুলসীর লেখক সাহিত্য-সমাজে অখ্যাত বা অপরিচিত নন্। তাঁর পরিচিতির কোন প্রয়োজন হতো না যদি না কর্মযন্ত্রের নিষ্পেষণে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তাঁকে এই দীর্ঘদিন দূরে থাকতে হতো। তাই তিনি এ যুগের পাঠকপাঠিকাদের কাছে অপরিচিত হলেও এ যুগের প্রথমভাগের সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী মাত্রের কাছেই তিনি সুপরিচিত। প্রফুল্লবাবু আজীবন সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যানুরাগী। এবং বলতে কুণ্ঠা নেই প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিক। সাহিত্যকে তিনি পেশা বলে গ্রহণ করেন নি, কাজেই এ যুগের ভুঁইফোড় সাহিত্যিকদের মতো নিজের ভেঁপু নিজে বাজাবার প্রয়োজন হয় নি। তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আজো বাণীমন্দিরের আশেপাশে ছড়ানো আছে। বনতুলসী তারই কতকগুলি সংগ্রহ।

প্রফুল্লবাবুর অপরিণত ছাত্রজীবনের প্রথম রচনা প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর আট আনা সিরিজের উপন্যাস "গৃহকল্যাণী"। তারপরেও "ঝড়ের আলো" "ঘুর্ণী" এবং "বুকের আগুন" উপন্যাস পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়। তিনি "মানসীও মর্মবাণী" "মাসিক বসুমতী" "দেশ" "বঙ্গশ্রী" "শারদীয় আনন্দ বাজার" প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন।

বনতুলসীর মাঝে তাঁর বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গী, তাঁর কাব্যধর্মী সাবলীল ভাষা এবং মনোবিশ্লেষণধর্মী দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ যুগের পাঠক পাঠিকাদের সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই বনতুলসী প্রকাশ করলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যে লিপিটুকু দিয়েছেন সেটীও এখানে প্রকাশ করা গেল।

প্রকাশক

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল বাংলা সাহিত্যে নবাগত নন্। ত্রিশ বছর আগেই তিনি গল্প উপন্যাস লিখে সাহিত্য সংসারে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু গত যুদ্ধের পর তিনি কর্মসূত্রের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে সাহিত্যচর্চার সুযোগহীন হয়ে পড়েছিলেন। তবুও মাঝে মাঝে গল্প লিখেছেন এবং সে সব গল্প মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছে। এ পাঠকবর্গের মধ্যে আমিও একজন। এই গল্পগুলি এখন 'বনতুলসী' নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হল। আরো অনেক পাঠক গল্পগুলি পড়বার সুযোগ পেলেন। আমি ভরসা রাখি যে তাঁরাও আনন্দ পাবেন।

এখনকার দিনের পত্র পত্রিকায় যে সব গল্প পড়ি তার অধিকাংশেই গল্পত্বের মাত্রা খুব বেশি থাকে না। অর্থাৎ এখনকার ছোট গল্পের লক্ষ্য গল্প বলার চেয়ে স্বগত চিন্তার দিকে ঝোঁক দিয়েছে। এতে দোষ নেই। তবে ভয়ে ভয়ে বলব যে আত্মচিন্তার ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রচেষ্টার প্রচণ্ডতায় গল্পরস শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রফুল্লবাবুর গল্প গল্পই। গল্প শুনতে গল্প পড়তে যাঁর ভাল লাগে তাঁর কাছে এ গল্প-গুলি ভাল লাগবে।

প্রফুল্লবাবু সাহিত্যব্যবসায়ী নন। তাই তাঁর গল্পে ভেজাল দেবার চেষ্টা দেখা যাবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮. ৩. ৫৭

শ্রীসুকুমার সেন।

ইহাদের মাঝখানে বসিয়া নিজেকে আজ হঠাৎ কতটা ছেলেমানুষই না মনে হইতেছে!

ইন্দিরা-দিদি বলিলেন, তোকে দেখিচি, সে আজ কতদিন আগে জানিস ভাই?

তাঁহার ঠিক পাশে একটা দিগম্বর শিশু দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াছিল। দিদি তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—ঠিক এই—ঠিক এতোটুকু। গলায় এত্তো বড় একটা মাদুলী আর হাঁসুলী, কোমরে বোর—

না হাসিয়া পারিলাম না। নিজেকে একটী মাদুলী হাঁসুলী ও বোর-পরা নগ্ন শিশুরূপে কল্পনা করিতে এই বর্তমান সভ্যতার যুগে যতখানিই বাধুক, তবু সেটা যে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার একেবারেই উপায় ছিল না।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কে?

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—ওমা, নাতি যে! দিলুর ছেলে। দিলুকে তোর মনে পড়ে না বুঝি?

হ্যাঁ, দিলীপকে আমার খুবই মনে পড়ে। কলিকাতায় একই হোষ্টেলে থাকিয়া আই-এ পড়িতেছিলাম, হঠাৎ আমি বাঁকুড়ায় পড়িতে গেলাম। তারপর হইতে আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। শুধু মাঝে একবার শুনিয়াছিলাম, এম-এ পাশ করার পর সে কিসের নাকি বড়-রকমের একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে।

অনুকূল বাবু ওদিকে বসিয়া চোখ বুজিয়া গড়গড়ার নল টানিতে-ছিলেন। বলিলেন, দিলু এই এলো বলে'! তুমি ততক্ষণ ধড়াচূড়ো খুলে বসো ঠাণ্ডা হ'য়ে। আজ তোমার যাওয়া হচ্ছে না, তা বলে রাখ্‌ছি। হঠাৎ আজ মক্কেলের টানে এতদূর এসে পড়েছ তাই, নইলে কি আর দেখা হ'ত?

অনুকূলবাবু জজকোর্টের সেরেস্তাদার। সম্প্রতি যশোরে বদলী হইয়াছেন। ওকালতির কাজে একবার যশোরে আসিতে হইয়াছিল; সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তাঁহার এই স্নেহের দাবীটুকু অগ্রাহ্য করাতে বাহাদুরী তো নাইই, বরং লজ্জা ও অনুতাপই আছে ঢের বেশী। সুতরাং সেদিনটা থাকিতেই হইল।

একটু পরেই দিলীপ আসিয়া হাজির হইল। বিশেষ কিছু বদল হয় নাই। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, রং ঠিক সুগৌর না হইলেও ফর্সাই বলিতে পারা যায়। তেমনি আনন্দচঞ্চল। তবে তাহারই পিছনে কোথায় যেন একটু অতি-গাম্ভীর্যের ছোপ ধরিয়াছে, যেটা তার এই বত্রিশ বছর বয়সের সঙ্গে যেন বেশ খাপ খায় না।

কত কথা, কত হাসি-গল্প! এই অল্প সময়টুকুর ভিতরেই দিলীপ কতখানি অন্তরঙ্গতাই না জমাইয়া তুলিল। বলিল,—'আপনি'—'আপনি' বলে লৌকিকতা করার অভ্যেসটা আমার কম। তা ছাড়া, সম্পর্কে যা-ই হও, বয়সের মর্য্যাদাটাকে চেষ্টা করলেও একেবারে বাতিল করা যায় না। মায়ের কাছে শুনেছি, আমি তোমার চেয়ে নাকি এক বছরের বড়—

আমি হাসিয়া বলিলাম,—হ্যাঁ, বড় বটে, তবে এক বছরের নয়, মোটে দু'মাসের। সে হিসেবটা আজই দিদির সঙ্গে হ'য়ে গেছে। কিন্তু বড় না হ'য়ে ছোট হ'লেও 'আপনি'টা আমি বরদাস্ত করতে পারতুম না।

সন্ধ্যার সময় দিলীপের বসিবার ঘরে বসিয়া এলোমেলো গল্প হইতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল,—কৈ রে, চা দিলি নে?

একটু পরেই দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া একটী যুবতী ঘরে ঢুকিল। আধ-ঘোমটার ফাঁক দিয়া মুখখানি তাহার মোটামুটী দেখা যাইতেছে। চোখ দুটী ঢাকা পড়িলেও লম্বা সরু নাক এবং মুখের নীচেকার অংশ-টুকু ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল।

দিলীপ বলিয়া উঠিল,—আরে বাস্ রে! একেবারে যে মহারাণী সশরীরে এসে হাজির! পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—অর্থাৎ, আসল নামটা হচ্ছে ওঁর 'রাণী', কিন্তু আমি পত্নীত্বের মর্য্যাদা বাড়িয়ে ওটাকে 'মহারাণী' করেছি। কেমন হয়েছে বল?

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,—বেশ তো! পরে একটু রসিকতার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া বলিলাম,—আর তুমিই যখন মালিক, তখন যা-খুসী তাই বলে ডাক্‌তে পারো।

—মালিক! তা বটে! বলিয়া দিলীপ হঠাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—এঁর কাছে ব'লেই কথাটা ব'লে পার পেয়ে গেলে, নইলে—

হঠাৎ সে চুপ করিয়া গেল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিলাম, কিন্তু সে যেন প্রশ্ন এড়াইবার জন্যই নিজের চোখ দুটা নামাইয়া লইয়া বলিল, খাও। এই নিমকিগুলোকে অশ্রদ্ধা করো না। তোমার এই বৌমাটীর ঐগুলিই হচ্ছে speciality।

তাহার স্ত্রী কতকটা জড়সড় অথচ কতকটা যেন সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা লইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। দিলীপ বলিল,—ব্যাপার কি? তোমার এমন করে দাঁড়িয়ে থাকার তো কোন মানেই হয় না। হয় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সো, নয়তো নিজের পথ দেখো।

শেষের কথাটাতে যেন বেশ একটু বিরক্তির ঝাঁঝ পাওয়া গেল। আমি একবার দিলীপের মুখের পানে চাহিয়া তাহার স্ত্রীর দিকে

চোখ ফিরাইয়া দেখি, সে তখন ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছে।

আমি দিলীপকে বলিলাম,—কথাটা কিন্তু তোমার একটু রূঢ় শোনালো।

সে বলিল,—উপায় নেই। কী মুস্কিল বল দেখি! তোমায় আমায় তু'বন্ধুতে কি সব কথা হবে, তাও শোন্‌বার ওর অধিকার আছে নাকি?

আমি ইহার জবাব দিব কিনা বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ এ ধরণের কথা আমার কাছে বলার অর্থই বা কি? বধূটিকে যতদূর দেখিলাম, দেখিতে তো বেশ সুশ্রীই! তার উপর বেশ ধীর, নম্র এবং সেবাপরায়ণা বলিয়াই তো মনে হয়। ইহার উপর স্বামীর বিরাগের কি কারণ থাকিতে পারে কে জানে।

পেয়ালার বাকী চাটুকু এক চুমুকে শেষ করিয়া ফেলিয়া দিলীপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—চল, একটু বেড়িয়ে আসি। এবং বেড়াতে বেড়াতে তোমাকে একটা মজার কাহিনী শোনাবো।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে বলিল,—বাড়ীতে তোমার যে বৌমাটিকে দেখ্‌লে, অর্থাৎ ঐ মহারাণী, উনি হলেন আমার দ্বিতীয় পক্ষ।

—দ্বিতীয় পক্ষ?

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলাম। সে হাসিয়া বলিল,—প্রথম পক্ষটি কিন্তু ঠিক গত হন্‌নি। তিনি বেঁচে আছেন, এবং এই সহরেই আছেন।

আমি কিছু বলিবার আগেই সে আবার বলিল,—সংসারে বন্ধু বল্‌তে একদিন অনেকেই আমার ছিল, কিন্তু আজ সকলকে ছেড়েছি, অর্থাৎ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। কেন না, অন্তরঙ্গ ভেবে অন্তরের কথা বল্‌তে গিয়ে সংসারের কারো কাছে আমি এতটুকু সহানুভূতি পাইনি। অথচ দেখ্‌ছি, এ আগুন বুকের মধ্যে চেপে

রাখাও কত বড় দায়! আজ তাই, তোমার কাছে, সব কথা না বলে থাক্‌তে পারছি নে। সহানুভূতি অবশ্য আমি তোমার কাছে দাবী করবো না। তবে আশা করি, তুমি আমাকে ঠাট্টা করবে না কিংবা ভুল বুঝ্‌বে না।

একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল,—প্রথম আমি যাকে বিয়ে করেছিলুম, সে একটী এম্-এ পাশ করা মেয়ে। সে সুন্দরী কি না, সে সব কথা কিছুই আমি বল্‌বো না। তবে বোধ হয় চোখে দেখ্‌বার আগে থেকেই আমি ভালবেসেছিলুম তাকে। বিয়ের আগে প্রথমে শুধু দেখেছিলুম তার একখানি ফটো। তারপর যখন চাক্ষুষ দেখা হোলো, তখন মনে হ'ল, সে আমার বহু যুগের সুপরিচিত মানুষ।

হঠাৎ তাহাকে চুপ করিয়া পথ চলিতে দেখিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম,—তিনি এখন কোথায়?

সে যেন একটা জাগ্রৎস্বপ্ন হইতে জাগিয়া বলিল,—বললুম তো, এই সহরেই। হ্যাঁ, এইখানেই, এখানকার গার্লস্ স্কুলের হেড-মিষ্ট্রেস্।

আমি আবার প্রশ্ন তুলিতেছিলাম, কিন্তু তার পূর্বেই সে বলিল,—হ্যাঁ, আমাকে সে ত্যাগ ক'রে গেছে। মাত্র দুটো মাস ছিল সে আমাদের বাড়ীতে। দিনের বেলায় অপটু হাতে এটা সেটা কাজ করতো, কিন্তু ভুল করতো প্রতিপদে। মনে হত, সব সময়েই যেন কেমন একটা অন্যমনস্কতা তাকে উদাস করে রাখ্‌তো। কত দেশ বিদেশের বই তার একটা সুটকেশে ভরা থাক্‌তো, রাত্রে সে পড়্‌তে সুরু করতো। তার সে পড়া সত্যিই যেন একটা সাধনা মণিমামা! তার পড়ায় কোনো দিনই আমি বাধা দিই নি। কতদিন মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, একখানা বই হাতে ক'রে চুপ চাপ জান্‌লার ধারে বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার আকাশ থেকে

নক্ষত্রের ফিকে আলো এসে ঝিক্‌মিক কর্‌তো তার মুখে, তার মাথার চুলে। মনে হ'তো বইপড়া বন্ধ করে' আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মাঝখান থেকে কী যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তুম। সে শুধু মুখ টিপে হাস্‌তো।......তু মাস আমার এখানে থাকার পর সে বাপের বাড়ী চলে গেল। কিছুদিন পরে সেখান থেকে খবর পেলুম, সে কোন্ মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে যাচ্ছে। বাবা তো শুনে ভয়ানক আপত্তি তুলে তার বাবাকে চিঠি লিখ্‌লেন এবং এ কথাও লিখ্‌লেন যে, ও সব কর্‌লে আমাদের সঙ্গে তার সব সম্বন্ধ শেষ হবে এবং নতুন করে আমার বিয়ে দিতেও পিছ্‌পা হবেন না। তার বাবা সে চিঠির কোনো জবাব দিলেন না, তার বদলে সে নিজে একখানা চিঠি লিখলে আমাকে। তাতে সে আমাকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলে যে, সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে, এবং পুনরায় বিয়ে করবার পুরো-পুরি স্বাধীনতা সে আমাকে দিচ্ছে অত্যন্ত হৃষ্টমনে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া তু'জনেই নীরব। অচেনা পথ ধরিয়া আমি শুধু যন্ত্রের মতই তার সঙ্গে চলিতেছিলাম। কোন্ দিকে যাইতেছি সে দিকে তাহারও যেন কোন খেয়াল ছিল না। এ যেন ঠিক একজন অন্ধ আর-এক অধিকতর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

একটা বাড়ীর সামনে আসিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে দৃষ্টি তুলিলাম।

কতকটা যেন আপনার মনেই সে বলিল,—কি আশ্চর্য! এ-পথে কখন যে এসেছি তা একেবারেই খেয়াল ছিল না। বলিয়া মুহূর্তক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ীটির রুদ্ধ দরজার শিকল ধরিয়া জোরে নাড়া দিল। একটু পরেই দরজা খুলিয়া একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলে বাহিরে আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—আসুন।

স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়াছিলাম। দিলীপ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—এসো।

সুতরাং ভিতরে গেলাম। ছেলেটি আমাদের নীচেকার বৈঠকখানা ঘরে বসিতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। আমি সেই সুযোগে দিলীপকে প্রশ্ন করিলাম,—কি ব্যাপার? কার বাড়ী?

সে একটুখানি ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল। বলিল,—এখানকার গার্ল্‌স্‌ স্কুলের হেড্‌মিষ্ট্রেস—মিসেস সুপর্ণা দে। ঐ ছেলেটি ওর ভাই। বাপ মারা যাবার পর থেকে দিদির সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

ইহার পর আমি কী যে বলিব ভাবিয়া ঠিক করিবার আগেই ভিতরে হাল্কা স্লীপারের শব্দ শোনা গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি লম্বা ছিপছিপে গড়নের মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—নমস্কার!

বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হইবে না। ধবধবে ফর্সা তাহার রং, লম্বা পাতলা দেহখানির মাথার দিক্‌টা যেন সামান্য একটু সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মাথার চুলগুলি বুঝি এলোমেলো অবস্থায় ছড়ানো ছিল, এইমাত্র তাড়াতাড়ি শুধু একটা ফাঁস জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছোট্ট মুখখানির উপর দীর্ঘায়ত কালো চোখই যেন সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে চোখদুটির পানে চাহিয়া যেন মনে হয়, এ-চোখের কাজ বুঝি বাহিরে নয়, তাহার নিজেরই অন্তরের দুর্ভেদ্য গুহায় গুহায় ইহাদের সন্ধানী দৃষ্টিটুকু নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—এমনই একটা স্বপ্নময় চাহনি সে চোখে! পরণে একখানি বাসন্তী রঙের ডোরা কাটা সাড়ী, গায়ে ফিকে আকাশ রঙের ব্লাউজ।

আমরা দুইজনেই নমস্কার করিলাম। তাহার ভাই তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুপর্ণা চেয়ারে বসিয়া তাহাকে বলিল,—তুমি বই নিয়ে ওপরে যাও, মন্টু।

মন্টু টেবলে ছড়ানো বইগুলি গুটাইয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

সুপর্ণা যেন তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর ঠোঁট দুটিতে চেষ্টা করিয়া একটু হাসির রঙ্ ধরাইয়া বলিল,—এঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই?

দিলীপ আমাকে দেখাইয়া বলিল,—ইনি—ইনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে ভরসা করলুম এইজন্যেই যে, আমাদের সম্বন্ধে কিছুই এঁর অজানা নেই।...যাক! হয়তো কিছু অন্যায় করিনি?

সুপর্ণা তেমনিই ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—অন্যায় আর কি! আমার এখানে আপনার আসার কোন বাধাই তো থাকতে পারে না, এতো আমি আপনাকে আগেও বলেছি!

দিলীপ যেন একটু কুণ্ঠিতের মত বলিল,—না। তবে কিনা, যদি তোমার পড়াশুনোর কোন রকম অসুবিধে—

সুপর্ণা বলিল,—আমার পড়াশোনা এমনই বা কি! এ সময়টা তো আমি শুধু মনুকেই একটু আধটু পড়াই—তা, তার জন্যে আপনার আসাতে এতটুকু অসুবিধে হয় বলে মনে করিনে আমি। যাক্, তারপর? আপনার বাড়ীর সব ভালো আছেন?

—হ্যাঁ, ভালই। কিন্তু....

—কি?

—বাড়ীর কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না সুপর্ণা।

সুপর্ণা যেন একটুখানি আরক্ত হইয়া বলিল,—কেন বলুন তো?

দিলীপ বলিল,—কেন তা জানি না। তবে কোরো না। আমার কাণে ওটা অত্যন্ত খারাপ লাগে।

সুপর্ণা একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল,—তা...বেশ তো....তবে আর জিজ্ঞেসা করবো না।

পরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—দেখছি, আজও আপনি আমাকে পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারেন নি। আশ্চর্য বটে!

দিলীপ যেন একটু উত্তেজনার স্বরে বলিল,—আশ্চর্য কিসে?

হাসিয়া সুপর্ণা বলিল,—নয়? আপনি আবার বিয়ে করেছেন এবং একটী ছেলেও হয়েছে, সে খবরও জানি ব'লেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলুম, যেমন বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের আগেকার সম্বন্ধের রেশটুকু বহু আগেই আপনার মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে।

দিলীপ একটু হাসিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সেই হাসির আড়ালে কি কতকগুলি খুব শক্ত কথা বলিবার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। কিন্তু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে অত্যন্ত করুণ স্বরে বলিল,—তার জন্যে চেষ্টা আমার দিক্ থেকে একেবারেই যে কম হয়েছে, তা মনে কোরো না, সুপর্ণা! কিন্তু, সকলের মন একই মসলা দিয়ে তৈরী নয় কি না, তাই তোমার ক্ষমতার চেয়ে আমার ক্ষমতা এতখানি কম। তবে একদিন হয়তো সত্যিই পারবো মুছে ফেলতে। এবং হয়তো একদিন তোমার আদর্শে এতটা অসাধ্যসাধনও আমার দ্বারা সম্ভব হবে যে, আর একটী দিনের জন্যেও আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

সুপর্ণা একবার তাহার চোখদুটী তুলিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। সে চোখে যেন একটা অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টি!

কত কথাই বুঝি সে তাহার ঐ নির্বাক দৃষ্টি দিয়া আমার কাছে নিবেদন করিতে চাহিল, কে জানে!

হঠাৎ কি ভাবিয়া সুপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিশেষ করিয়া যেন আমারই দিকে চাহিয়া বলিল,—আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি।

বলিয়া সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার শ্লীপারের শব্দটুকু মিলাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ হঠাৎ ঝড়ের মত

সশব্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—তা হ'লে চল মণিমামা, ওঠা যাক্।

আমি আমার বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মুখের পানে তুলিয়া ধরিতে সে হাসিয়া বলিল,—ও আজ আর আস্‌বে না। এমনি ক'রে হঠাৎ উঠে যাওয়ার মানেটাই হ'লো আমাদের চ'লে যেতে বলা। এ আমি এতদিন ধরে দেখে আস্‌ছি।

রাস্তায় আসিয়া আবার দুই জনে নির্বাক হইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ এক সময় দিলীপ বলিয়া উঠিল—স্বামী-স্ত্রীর এমন চমৎকার সাক্ষাৎ তুমি জীবনে আর কখনো দেখেছ কি? তা হ'লে যশোরে এসে আজ কতবড় নতুন জিনিষ একটা দেখে গেলে! বোধ হয়, জীবনেও ভুল্‌তে পারবে না।—বলিয়া সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিজের কর্মস্থানে ফিরিয়া আসার পর কয়েকদিনের মধ্যেই উহাদের স্মৃতিটা ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিলেও একেবারে ভুলিতে পারি নাই। ভুলিতে হয় তো কোনদিন তাহাদের পারিব না। সেই অপূর্ব রহস্যে ঘেরা সুপর্ণাকে আর সেই অর্ধাবগুণ্ঠিত নির্বাক বধূটিকে, এবং দুয়ের মাঝখানে পড়িয়া বেচারা দিলীপের সেই করুণ-তম জীবনকাহিনীটিকে। উহারা তিনটী প্রাণীই যেন তিনটি নক্ষত্রের মত আমার মনের আকাশে স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে। কর্ম-জীবনের মধ্যাহ্নের মাঝে হয়তো কখনো স্তিমিত হইয়া পড়ে, আবার অলস মনের অন্ধকারের মাঝে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকে।

সকলকেই বুঝিতে পারি। কিন্তু, যখনই ঐ সুপর্ণাকে মনে পড়ে, তখনই মনে হয়, উহাকে বুঝি কোনো দিক্ দিয়াই বুঝিবার উপায় নাই। প্রথম যে প্রশ্নটা সব চেয়ে বড় হইয়া মনের দুয়ারে আঘাত

দিতে থাকে, কোন উত্তরই তো তাহার খুঁজিয়া মেলে না। সাধারণ বুদ্ধিতে স্বামী-ত্যাগিনী বলিতে যাহা বুঝি, সুপর্ণা সম্বন্ধে সে কথা মনে করিতেও সারা অন্তর শিহরিয়া ওঠে। অথচ কেন যে, তাহা বলিতে পারি না। মনে হয়, সে যেন ঐ নগণ্যতার বহু—বহু ঊর্দ্ধে, নীচতার এতটুকু গ্লানিও বুঝি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মাস দুই পরে হঠাৎ পথে একদিন দেখিলাম, সুপর্ণার সেই ভাইটীকে। যাচিয়া গিয়া আলাপ করিলাম। সে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই। আমি সে-রাত্রির ঘটনাটার কথা বলিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার কথায় জানিলাম যে, মাত্র দিন দশেক হইল, সুপর্ণা এখানেই আসিয়াছে, এখানকার মেয়ে স্কুলের কাজ লইয়া। সুতরাং তাহার ভাইও সঙ্গে আসিয়াছে এবং এখানকার কলেজে ভর্তি হইয়াছে।

বেচারা দিলীপের কথা ভাবিতেছিলাম। সে হয়তো জানেই না যে, সুপর্ণা এখানে আসিয়াছে। আর জানিলেই বা কি? বাধা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও অধিকার তাহার যে একবিন্দুও নাই!

পরের দিন সকালেই সুপর্ণার ভাই মনু আমার বাড়ীতে আসিয়া জানাইল, সুপর্ণা আমার সহিত একবার দেখা করিতে চায়। আজই যদি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করি তো সে চিরকৃতজ্ঞ হইবে।

এ-অনুরোধ ঠেলিবার মত শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং দেখা করিতে গেলাম বৈকালের দিকে।

সুপর্ণা হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। ছোট তৃণাচ্ছন্ন উঠানটুকুর উপর দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি আমরা বসিলাম। কি বলিয়া কথা সুরু করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। এমন সময় সে হাসিয়া বলিল,—

আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন যে, আমি কেমন করে এখানে এসে পড়লুম। কিন্তু, এসেছি বললে হয়তো একটু ভুলই হবে! আসতে বাধ্য হয়েছি।

আমি তাহার মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে সে বলিল,—কিন্তু সে কথা এখন থাক্। সে প্রসঙ্গটা আপনার আমার কারও পক্ষে হয়তো রুচিকর হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—প্রসঙ্গটা না-শুনে তার বিচার করা তো কোনরকমেই সম্ভব নয়। তবে, এটা ঠিক্ যে, কোন কিছু একটা বিশেষ কথা বল্‌বার জন্যেই আমায় আজ এখানে ডাকা হয়েছে। তা, সেটা রুচিকর না হলেও বলাই বরং ভালো।

সুপর্ণা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—আপনাকে একটা অনুরোধ কর্‌বার জন্যে আজ—

—কি বলুন না? বলিয়া আমি তাহার মুখের পানে চাহিলাম। সেও ঠিক সেই সময় কি যেন বলিবার আগে আমার পানে চোখ তুলিয়াছিল। সেই অপরূপ দুটি চোখ দেখিয়া সহসা মনে হইল, হেমন্তের উজ্জল আকাশের পিছনে কোথায় বুঝি শিশির বিন্দু উঁকি মারিতেছে।

সুপর্ণা বলিল, সত্যিই আমি এখানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছি। এবং বাধ্য হয়েছি যে-জন্যে, একদিনের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের পরেই হয়তো তা আপনি বুঝতে পেরেছেন।...হ্যাঁ, তাঁরই ভয়ে আমি এখানে পালিয়ে এসেছি।

বলিয়া খানিকক্ষণ নীরবে মাটির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া পরে আবার মুখ তুলিয়া বলিল,—কাল রাস্তায় মন্মর সঙ্গে দেখা হবার পরেই আপনি তাঁকে একথা জানিয়েছেন কি না, তাও আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি নে—

—কি কথা ?

—যে আমি এ-সহরে কাজ নিয়ে এসেছি ?

বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিলাম,—কী আশ্চর্য ! সে-কথা আমি তাকে জানাতে যাবো কেন ? তাও যদি আমি আপনাদের সব কথা না জানতুম !···একদিন আপনারা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন, এইমাত্র ! কিন্তু সে বন্ধন তো আপনি নিজের হাতে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' ছিঁড়ে ফেলেছেন।

কথাগুলো মুখ দিয়া বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই যেন লজ্জিত হইলাম। এতখানি ক্ষুব্ধ ভৎর্সনার কথা কেনই বা আমি বলিতে গেলাম ?

সুপর্ণা যেন কষ্টে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—কথাটা আপনি যেমন সহজ করে বুঝেছেন, তিনিও যদি তেম্‌নি করে বুঝতেন, তা হলে তো আমার কোন কিছুই বলবার ছিল না ! কিন্তু, আমি যে সত্যিই বুঝতে পারিনে, কেন এখনো তিনি এমন করে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসেন। তিনি আজ অপরের স্বামী, একথাই বা কেমন করে ভুল্‌তে পারলেন !

আমার মুখ দিয়া যেন অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া গেল—যেমন করে আপনি ভুলতে পেরেছেন যে, সে আপনারও স্বামী !

সুপর্ণার চোখদুটি যেন একবার ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল,—একের দোষ দেখিয়ে অপরের দোষকে justify করাটা তো অভ্রান্ত হবে না, মণিবাবু !

আমার নাম জানিল কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সুপর্ণা হাসিয়া বলিল,—নাম জানাটা এমন আর কি সমস্যার ব্যাপার ? আপনার বাড়ীতেও নেম্‌প্লেট আছে। তবে, সত্যিই জেনেছি, আপনার বন্ধুর কাছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—রোজই কি সে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তো ?

সে জবাব দিল,—আসতেন প্রায় রোজই। কিন্তু অনেকদিন আমি বাড়ী না থাকায় দেখা হোত না।

—আর, আপনার সেই বাড়ীতে না-থাকাটা যে আপনার ইচ্ছাকৃত, সে অনুমান করলেও বোধ হয় ভুল হবে না।

সুপর্ণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—না, ভুল নয়। কিন্তু তা ছাড়া আমার উপায় ছিল না যে!

—উপায় ছিল না? তা বটে! আগে বাংলা অভিধানে স্বামী মানে ছিল প্রভু; তারপর হোলো সাথী। আপনার মত বিদুষী সে-মানেটুকুও উল্টে দিলেন দেখ্ছি।

ধাক্কা খাইয়া আবার যেন তাহার মুখখানি বিবর্ণ এবং চোখদুটি ঝাপসা হইয়া উঠিল। পূর্বের মত তেমনই ক্লান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিল,—রাগের বশে আপনিও আমার উপর এমনি অবিচার করবেন তা ভাবিনি।

—অবিচার কিসে?

—একটু আগেই আপনি বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী একদিন আমরা ছিলুম মাত্র, কিন্তু সে সম্বন্ধ আজ—

এ কথার প্রত্যুত্তর হঠাৎ আমার মুখে জোগাইল না। সে বলিল,—আপনি বল্‌বেন, তার জন্যে আমি দায়ী। হয়তো সত্যিই আমি দায়ী! কিন্তু দোষ ত্রুটি তো মানুষের থাক্‌বেই; আমারও আছে। আমারও নিজের একটা মন আছে, যেখানে তার স্বাধীনতার অধিকারটুকু সে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ রাখতে চায়। আর, স্বাধীনতা থাক্‌লেই থাক্‌বে তার ভালো এবং তার মন্দ। আমার মন্দটুকু যদি কেউ বড় করে দেখে, তার জন্যে যেমন আমি কারু বিরুদ্ধে এতটুকু অনুযোগ করতে যাবো না, আমার ভালোটুকুর জন্যেও তেমনি কারু কাছে প্রশংসার প্রার্থী হয়ে তো দাঁড়াতে চাইনে!

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,—অনুযোগ বা প্রশংসা

কিছুই আমি করতে চাইনে, তার অধিকারও আমার নেই। শুধু এইটুকু জানি, দিলীপ আপনাকে আজও এতখানি ভালবাসে যে, সংসারের যে কোনো মেয়ে তার সেই অর্ঘ্যটুকু মাথায় তুলে নিয়ে কৃতার্থ হ'তে পারতো!

যেন আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই সুপর্ণা বলিল,—আমিও হয়তো পারতুম্, যদি না এইটুকু জানতুম যে এ সংসারে ওর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছু নেই! সত্যি ক'রে বলুন দেখি, কতটুকু মূল্যই বা ঐ ভালবাসার? একবার ওর কাছে ধরা দিয়ে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন, ওর চেহারা কতখানি পাল্‌টে গিয়েছে, ওর সে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি আর নেই! দেখবেন, মুক্ত প্রান্তরের সুগন্ধী বাতাসটুকু হঠাৎ কেমন করে সহরের বদ্ধবায়ুতে পরিণত হয়ে শুধু কেবল জটিল হতে জটিলতর রোগেরই সৃষ্টি করছে, সঞ্জীবনী শক্তি তার একবিন্দু নেই! মানুষের ভালবাসার মত এত বড় বঞ্চনা সংসারে আর কিছু নেই মণিবাবু, এ আমি বেশ জানি।

বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিলাম। সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলাম,—আপনার স্বামীর সম্বন্ধে ও-কথাটা যে ভুল নয়, এটার প্রমাণ কিছু পেয়েছেন নাকি আপনি?

—না। কিন্তু, প্রমাণের প্রয়োজনও কিছু নেই। যেটা সব মানুষের পক্ষে, সব পুরুষ, সব মেয়ের পক্ষেই সত্যি, সেটা তাঁর পক্ষেই বা মিছে হবে কেন? সকল যুগে সকল দেশেই এ-কথা প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কিন্তু, তা সত্বেও মানুষ শুধু চোখ বুজে চলতে চায় বলেই এই নিদারুণ ব্যর্থতাকে বিপুল সার্থকতা ভেবে বিহ্বল হয়ে থাকে! জগতের কোন্‌দিকে কোথায় এর দৃষ্টান্ত দেখতে চান্, তাই বলুন? ডাইভোর্সের স্বাধীনতাও যেমন এ ব্যর্থতার হাত এড়াতে পারেনি, সংস্কারের গোঁড়ামীও পারেনি। তা হয় না, হয় না, কোনো-দিনে—কোনো কালেই তা হবে না।

মনে হইল, কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখখানিও যেমন পাণ্ডুর হইয়া আসিতেছে, স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটীতেও যেন একটা ঘন কুয়াসা নামিতেছে।

আকাশের বুক ছাপাইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার দিনের আলোকে ঝাপসা করিয়া আনিতেছিল। মনে হইল, আমার চোখের সামনের ঐ মেয়েটির চারিপাশেও একটা স্বচ্ছ অন্ধকারের সূক্ষ্ম আবরণ ঘনাইয়া উঠিতেছে। মনে হইল, সে যেন অকস্মাৎ কোন্ সময় আমার বহু—বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইবার অধিকার আমার নাই, এ সংসারে কাহারো বুঝি নাই!

সেদিন বিদায়ের আগে তাহার ব্যাকুল আবেদনের উত্তরে এইটুকু তাহাকে জানাইয়া আসিয়াছিলাম যে, আমি দিলীপকে তাহার সম্বন্ধে কোনো সংবাদই দিই নাই, কোন দিন দিবও না। এ বিষয়ে সে চিরদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সুপর্ণার সহিত আর দেখা হয় নাই। এক একবার ইচ্ছা হইলেও সে ইচ্ছা দমন করিয়াছি। কেন না, সেইদিন হইতেই তাহাকে যেন কেমন একটা ভীতির চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছিলাম। উহাদের কথা মনে পড়িলেই মনে হয়, এম্‌নি করিয়াই মানুষের চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বটীর বুঝি কোন কালেই মীমাংসা হইবে না!

হঠাৎ সেদিন কোথা হইতে দিলীপ আসিয়া হাজির। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। কাছারী যাইবার জন্য সাইকেল লইয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখি, সে আসিতেছে।

সে বলিল,—বিশেষ কোনো কাজ নেই তো আজ?...তবে থাক্‌গে, আজ আর নাই বা গেলে। রোজই সেই একঘেয়ে কাছারী, আর মক্কেল, আর হাকিম, আর মামলা—

বলিলাম,—নইলে আর তোমার মত রোমান্স পাবো কোথায় বল? তোমার ঐ অতি-পুরোণো মামীমাটিই হচ্ছেন আমার এক-মেবাদ্বিতীয়াম্—

কাছারী আর যাওয়া হইল না। দিলীপ বলিল,—উঃ, আজ যে ক'রে বাড়ী থেকে এসেছি, মণিমামা! সেই যাকে বলে, বাঁধা গরুর দড়া ছিঁড়ে ছুট দেওয়া, ঠিক তাই! তোমার মহারাণী বৌমাটি রীতিমত পিকেটিং স্বুরু করে দিয়েছিল আর কি! সেও কিছুতেই আস্তে দেবে না, আমিও ছাড়বো না।

—কেন হে?

—বাঃ, ঐ যে শুনেছে যে, স্বুপর্ণা এখানে এসেছে এবং সেই জন্মেই আমি আস্ছি। উঃ, কত বড় হিংস্বুটে জাত এই মেয়ে-মানুষ—

হাসিয়া বলিলাম,—কিন্তু, স্বুপর্ণা? আমি তো জানি, তার মনে এত টুকু হিংসে নেই। থাক্‌লেই বরং আজ তুমি খুসী হতে।

—দুঃর্! কী যে বল! স্বুপর্ণা আর সে!

আমি হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম,—কিন্তু সে তোমার ধর্মপত্নী, আর স্বুপর্ণা তোমার কেউ নয়।

—স্বুপর্ণা কেউ নয়? কী বল্ছো, মণিমামা? স্বুপর্ণা কেউ নয়?

—তবে আবার এ বেচারাকে বিয়ে কর্‌লে কেন শুনি?

—কেন?...তা—সত্যি, সেটা একটা সমস্যার কথাই বটে! নিজেই যে তার জন্মে নিজেকে কত ধিক্কার দিয়েছি, তা আমিই জানি। কিন্তু আজ বুঝতে পারি, বিয়ে করেছিলুম শুধু স্বুপর্ণাকে এতখানি ভাল-বাস্তুম বলেই। সেই স্বুপর্ণা, যাকে পেয়ে আমি স্বর্গের দেবীকে ঘরে পেয়েছি বলে আত্মগৌরবে ফেটে পড়েছিলুম, সেই যেদিন এমন করে আমার সকল দাবী অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, সেদিন—সেদিন আমার আহত আত্মাভিমানের মুখে কোনো কিছুই

করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। সেদিন আত্মহত্যা করাটাও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বিয়ে করাও তাই অসম্ভব হোলো না! কারণ আসলে ওটা আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই নয় তো। অথচ, সেদিন মনে করেছিলুম, আবার বিয়ে ক'রে কতটা জব্দই না তাকে করলুম! ভেবে-ছিলুম, জীবনে আর কোনোদিন তার মুখ দেখবো না। কিন্তু এমনি মানুষের এই অভিশপ্ত মন মণিমামা, এক বছর পড়ে হঠাৎ যেদিন যশোরে দেখা হোলো তার সঙ্গে, সেদিন থেকে ছায়ার মতো—হ্যাঁ, ঠিক ছায়ার মতই তার পিছু পিছু ঘুরতে সুরু করলুম। সেদিন মনে হোলো, স্বামিত্বের অহংকারের বড়াই করা সাজে শুধু ঐ রাণীর মত মেয়েদের কাছেই। সুপর্ণারা অন্য জগতের মানুষ, ওদের কাছে ওসব কথার কোনো মানে নেই, কোনো দামই থাক্‌তে পারেনা!

কথায় কথায় জানিলাম, আজই সে দেখা করিতে চায় সুপর্ণার সহিত।

আমি নিষেধ করিলাম। কিন্তু সে বলিল,—তা হয় না মণিমামা। তাকে আমি চিঠি দিয়েছি যে! সে নিশ্চয় আমার অপেক্ষা করে' থাক্‌বে!

চিঠিও দিয়াছে! বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। কিন্তু, ব্যথাটা ঠিক কার জন্য,—সুপর্ণা না দিলীপ—তা ঠিক বুঝিলাম না।

বৈকালে সে সুপর্ণার বাড়ী গেল। আমি তাহার ফেরার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার সময় সে ফিরিয়া আসিল।

ধপ্‌ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—আজ দস্তুর মত ঝগড়া করে এসেছি, মণিমামা!···সে আমার কেউ নয়, এ কখনো হতেই পারে না যে! আমার স্ত্রী, হ্যাঁ, ধর্মপত্নী বল্‌তে যদি কেউ আমার থাকে তো সে ঐ সুপর্ণা! তার তুচ্ছ একটা খেয়ালের বশে এত বড় সত্যটা কখনই মিছে হতে পারে না। সে দাবী আমি কখনো

ছাড়্তে পারিনে।. হ্যাঁ, সে দাবী আমি আজ তার কাছে রীতিমত জোরের সঙ্গে জানিয়ে এসেছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—তারপর ? সে কি বল্লে ?

সে উৎফুল্লের মত হাসিয়া বলিল,—বেশ একটু বিপদে পড়ে গেল আর কি ! কিন্তু ও-সব আমি দেখতে যাবো কেন ?···সে শুধু ছু'মাসের সময় নিয়েছে।

—অর্থাৎ ? ছু'মাসের পর—

—হ্যাঁ, আজ থেকে ছু'মাসের পর সে আমার কাছে ফিরে আস্‌বে। হাস্‌ছো যে ?

—কী মুস্কিল ! এত বড় খুসীর কথাতে হাস্‌বো না আমি ? কী যে বল ?

পরের দিন সকালের ট্রেণেই দিলীপ বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার পর হইতেই আমার মনে একটা অদম্য আগ্রহ জাগিতে লাগিল, স্থপর্ণার সহিত একবার দেখা করার জন্য। কিন্তু যুক্তি দিয়া দিনের পর দিন গত করিয়াও শেষ পর্যন্ত সত্যই একদিন না গিয়া পারিলাম না।

দেখা কিন্তু হইল না। শুনিলাম, সে পূজার ছুটির আগেই আরও একমাসের ছুটি লইয়া কোথায় নাকি গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কেহ কিছুই জানে না।

সেবার পূজার ছুটিতে গৃহিণীকে কলিকাতায় রাখিয়া কয়েকদিনের জন্য পুরী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে দিলীপের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

আকাশে তারা থাকিতে থাকিতেই স্থর্যোদয় দেখিবার লোভে সৈকতের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। সেদিন পূর্বাকাশে মেঘের

কণামাত্র ছিল না। সাগরের জলে আর পাণ্ডুর আকাশের কোলে বুঝি কোন্ পূজার্থিণী দিগঙ্গনাদের নটকোনা রঙের সাড়ীর ছোপ ধরিয়া উঠিয়াছিল। সেইদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যখন তন্ময় হইয়া ছিলাম, সেই সময় কে আমার পিছন হইতে জামা ধরিয়া টান দিল। ফিরিয়া দেখিলাম। দিলীপ এবং তাহার খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া সেই তার দ্বিতীয় পক্ষের বধূ রাণী। তেমনই সঙ্কুচিত, অথচ যেন চিরসজাগ ভাবটুকু তাহার অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখে, তাহার দাঁড়াইবার বিশিষ্ট ভঙ্গিমাটিতে।

দিলীপ বলিল,—মা বাবা সকলে আমরা পুরী এসেছি যে। শরীরটা এম্‌নি খারাপ যাচ্ছে, কি বল্‌বো! তা, তুমি কবে এসেছ, একটা খবরও কি দিতে নেই?

সেই গরিমাময় সূর্যোদয় দেখিতে দেখিতে ছুজনে এটা সেটা কত কথাই যে হইতে লাগিল!

হঠাৎ এক সময় দিলীপ বলিল,—আরে, আসল কথাই যে ভুলে যাচ্ছি, মণিমামা! সুপর্ণা একখানা চিঠি দিয়েছে। ছু'মাসের যে আর দেরী নেই, সে কথা সে ভোলেনি কিন্তু।

বুকপকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সে আমার হাতে দিল। তখনও দিনের আলো বেশ পরিস্ফুট হইয়া না উঠিলেও একটু কষ্ট করিয়া চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

তুমি আমাকে ছু'মাসের সময় দিয়েছিলে। ছু'মাস পূর্ণ হ'তে আর দেরী নেই। তাই এই চিঠি দিলুম।

আমি অনেকবার তোমার কাছে মার্জনা চেয়েছি, পাইনি। কিন্তু, আজ এই চিঠি পাবার পর মার্জনা করা ছাড়া তোমার কোনো উপায়ই আর থাক্‌বে না।

আজ এই ছু'বৎসর ধরে যেখানেই যেমন ভাবে আমি থেকেছি,

তুমি আমার পিছু নিয়েছ। শেষ যেদিন আমাদের দেখা হলো, সেদিন কত কি কটূ কথাই তুমি আমাকে বলেছিলে! তার মধ্যে এ কথাটাও জানিয়েছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই অন্য কোন পুরুষকে ভালবাসি, যার জন্যে তোমাকে আমি স্বীকার করতে পারছি না। ঐ কথাটা আমি দিনের পর দিন এবং বিনিদ্র রজনীতে শুয়ে শুয়েও ভেবেছি। কিন্তু না, সংসারে সত্যই এমন কোন পুরুষ নেই যাকে আমি ভালবাসতে পেরেছি। এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বল্‌তে পারি। মনে করো না, তার জন্যে নিজের মনে মনে ব্যথাও আমি কম পেয়েছি। তোমার ব্যগ্র ব্যাকুল চোখের পানে চেয়ে, দিনের পর দিন তোমার ঐ দুর্দমনীয় একাগ্রতা দেখে একসময় এমনও আমার মনে হয়েছে যে, সকল বাধা—সকল দ্বিধার কণ্ঠরোধ করে, নিজেকে লুটিয়ে দিই তোমার আলিঙ্গনের মাঝে! তাতে আমার যত বড়ই ক্ষতি হোক্ না কেন, তোমাকে শান্তি দেবার জন্যে কোন ক্ষতিকেই আমি আর গ্রাহ্য করবো না। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিক মোহ। তার কাছে আত্মবিসর্জন দিতে আমি পারিনি। কেন না, প্রেমের যে রূপটিকে আমি চিরজাগ্রত করে রেখেছি, তাকে এমনি করে' কলুষিত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মার মৃত্যুও যে অবশ্যম্ভাবী!

তুমি জান্‌তে চেয়েছিলে, আমি সত্যিই কাউকে ভালবাসি কি না। ভালবাসি না একথা বল্‌লে হয়তো মিথ্যা বলা হবে। আজ বিদায়ের আগে তাই এইটুকু তোমাকে জানিয়ে যেতে চাই যে, আমি সত্যই ভালবেসেছি এমন একটি মানুষকে, যার প্রেমে উদ্দামতা আছে, কিন্তু অবসাদ নেই; তীব্রতা আছে, কিন্তু দাহ নেই; অধিকারের এতটুকু দাবী যে কোনো দিনই করে না, অথচ, না-চাইতেই নিজের হাতে যাকে সর্বস্ব তুলে দিয়েও তৃপ্তি হয় না। আমি ভালবাসি শুধু তাকেই, প্রেম দিয়েও যে কোনোদিন তৃপ্ত হয় না, যার প্রেম গ্রহণ করার মধ্যেও থাকে একটা চিরদিনের অতৃপ্তি!

তুমি হয়তো বল্‌বে, এটা আমার শুধু মারাত্মক রকমের আদর্শবাদ। কিন্তু কি কর্‌বো, তা সত্য হলেও উপায় নেই। এর সবটুকুই যেন আমার অস্থিমজ্জায়—প্রত্যেক রক্ত-কণিকাটীতে মিশে রয়েছে। আমি আত্মহত্যা কর্‌তে পারি, তবু আমার এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে পারি নে।

এক একবার মনে হয়েছে, জগতে প্রত্যেক মেয়ের কাছেই তার স্বামীই হয়তো এই আদর্শ পুরুষ, কিন্তু, ভেবে দেখেছি, এর চেয়ে হাস্যাস্পদ ব্যাপার সংসারে আর কিছু নেই।

তুমি বিদ্বান, অন্তরে তোমার অন্ধকারের গ্লানি থাক্‌তে পারে না; চির-ভাস্বর সে। নিশ্চয় তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তাই, আজ তোমার সেই চির-প্রশান্ত অন্তরের কাছে আমার প্রণাম জানিয়ে মার্জনার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে চললুম। কোনদিন আর আমার খোঁজ কোরো না। কারণ, কোনোদিনই যাতে আমার খোঁজ না পাও, তার ব্যবস্থাই আমি করে যাচ্ছি।

বিদায়।

—তোমাদের

সুপর্ণা।

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, বধূ কখন দিলীপের খুব কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। দিলীপ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সাগরের পানে চাহিয়া আছে, আর বিক্ষুব্ধ সিন্ধু অসংখ্য বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া বুঝি ঐ অনন্ত আকাশকেই ধরিতে চাহিতেছে।

ব্যারিষ্টার মিঃ সুশান্ত ঘোষাল মোটরযোগে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে। মিষ্টারের বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে কি হয় নাই, পসার প্রতিপত্তি ভালই, এবং কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে সম্প্রতি একটী বাড়ীও কেনা হইয়াছে। গৃহিণী প্রণতি। শান্ত-স্তিমিত জ্যোৎস্নার মত লাবণ্য তাঁহার সারা দেহে লাগিয়া আছে, এবং বুঝিবা মনেও। তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অধরবিলীন হাসিটুকু হইতে। শ্রীলা বড়, এবার ম্যাট্রিক দিবে, মণ্টু তাহার বছর চারেকের ছোট হইবে।

কথা আছে, বরাবর আগ্রা ঘুরিয়া দিল্লী যাইবার। কিন্তু প্রণতি জিদ্ ধরিয়াছেন, পথে বিশ্বনাথ দর্শন সারিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং উপস্থিত গন্তব্য কাশী। পথে বিশ্রাম করিবার কথা আসানসোল ও হাজারীবাগে।

মোটরে এতটা রাস্তা প্রণতি ইতিপূর্বে কখনো যান নাই। অপূর্ব আনন্দে তাঁহার বুক দুলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের উদ্দাম আনন্দ-চঞ্চলতার কাছে নিজের আনন্দ প্রকাশ করা চলে না, সুতরাং চেষ্টা করিয়াও মুখ বুজিয়া যাইতেছিলেন। মিঃ ঘোষাল বলিতেছিলেন,—তোমার একদম্ ভালো লাগ্ছে না বুঝি? তাই একটাও কথা বল্‌ছো না?

—চমৎকার লাগ্ছে। কিন্তু, এক-একবার মনে হচ্ছে—

—কি?

—হয়তো এ ভাবের যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। যাচ্ছি বিশ্বনাথের দর্শনে। অথচ, এই আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে—

একটা বাঁকের মুখে মিঃ ঘোষাল ষ্টিয়ারিং ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন,—ও! তোমার বিশ্বনাথ বুঝি আধুনিকতা ভালবাসেন না? আমার বিশ্বনাথ কিন্তু একেবারে up-to-date! সত্যি, কী যে হচ্ছ দিনদিন!

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর একশো মাইলের মাইলপোষ্ট কখন্ পার হইয়া গিয়াছে। গাড়ী ছুটিতেছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। শ্রীলা আর মণ্টু রাস্তার গরুর গাড়ী আর মাইল পোষ্ট গণিতেছে।

বেলা পাঁচটা বাজে। এইভাবে গেলে সন্ধ্যার পূর্বেই আসানসোলে পৌছানো যাইবে। তার করিয়া সেখানকার ডাক বাংলোয় থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। স্থতরাং কোন দিকে উদ্বেগের এতটুকু কারণও নাই।

সাম্‌নে আরও কয়েক মাইল দূরে দুর্গাপুরের বিশাল জঙ্গল দেখা যাইতেছে। জঙ্গল ভেদ করিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ঐ বনানীর আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়িয়াছে। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে স্থরু করিয়াছে।

হঠাৎ কি একটা গোলযোগ ঘটিয়া গেল। কেমন একটা বিশ্রী শব্দ করিয়া গাড়ী ক্রমশঃ মন্দগতি হইতে হইতে একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার দরজা খুলিয়া নামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে, এখনই সব ঠিক হইয়া যাইবে। লম্বা পথ চলিতে গেলে এমন গোলযোগ ঘটিয়াই থাকে। স্থতরাং সে দিকে কেহ কোন চোখ কাণ দিল না। দুর্গাপুরের জঙ্গলের বিশালত্ব, তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বামি-স্ত্রীর আলোচনা চলিতেছিল।

মণ্টু জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে বাঘ আছে বাবা?

শ্রীলা তাহাকে কনুয়ের গুঁতা দিয়া বলিল,—যা—যাঃ, বাঘ নাকি এতই সস্তা ?

কিন্তু বাঘ সস্তা কি মহার্ঘ, সে সম্বন্ধে তাদের বাবা-মা কেহই কোনরূপ মনোযোগ দিলেন না। খানিকক্ষণ পরে মণ্টু বলিল,—মোটর খারাপ হয়ে গেছে বাবা।

শ্রীলা বলিল,—ধ্যেৎ! মোটর নাকি খারাপ হয় রে, বোকারাম! এ ঐ গরুর গাড়ী পাস্‌নি যে, এক ঘণ্টার রাস্তা যেতে পঞ্চাশ ঘণ্টা লাগবে।

পাশের গরুর গাড়ী দুখানা কিন্তু ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ করিতে-করিতে স্বচ্ছন্দে আগাইয়া চলিল, মোটর এক চুল নড়িল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া বনেট খুলিয়া যন্ত্রপাতি লইয়া খুট্ খাট্ করিয়াও সফার যখন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না, তখন সুশান্ত নিজে নামিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ইঞ্জিনের কতটুকুই বা বোঝেন! সফার আশ্বাস দিল, শীঘ্রই সে সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। সফার মাটীতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া কি সব দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সে হাতল লইয়া ষ্টার্ট দিতে গেল, কিন্তু গাড়ী অনড়, অচল। সফারের মুখ রক্তবর্ণ, সারাদেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

সুশান্ত বলিলেন,—ব্যাপার কি হে শিবু?

—আজ্ঞে—

—'আজ্ঞে' মানে? আজ রাত্রে এইখানেই থাক্‌তে হবে না কি?

সফার কপালের ঘাম ঝাড়িতে ঝাড়িতে যাহা বলিল, তাহাতে এক-একে সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। প্রণতির মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

—ও মাগো, এখানে এই মাঝ রাস্তায় ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করবো আমি বল দিকি!

সুশান্ত সফারকে খানিকটা নিষ্ফল তিরস্কার করিয়া ঘন-ঘন ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

পাশ দিয়া একখানি গরুর গাড়ী যাইতেছিল। ছোক্‌রা গাড়োয়ানটা চড়া গলায় একটা সন্ত-শেখা যাত্রার তান ধরিয়াছিল। সুশান্ত তাহার গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রেল ষ্টেসন এখান হইতে কতদূরে তাহা সে জানে কিনা!

গাড়োয়ান একটু থতমত খাইয়া জানাইল, ও সব কিছুই সে বলিতে পারে না। গাড়ীর উপর একজন প্রৌঢ় গোছের লোক নাক ডাকাইয়া পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল। গাড়োয়ান তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া ডাকিয়া তুলিল।

লোকটা গ্রাম্য চৌকিদার। ঘুম ভাঙ্গিয়াই সামনে এই মোটর গাড়ী এবং তার আরোহী এই সৌখীন পরিবারটীকে দেখিয়া একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহারই কাজের কি একটা গাফিলির জন্য গুরুতর কিছু অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং হাত উঠাইয়া সেলাম করিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ঘোষাল কি বলিতে গিয়া লোকটার মুখের পানে অনেকক্ষণ নিষ্পলক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে দিয়াশালাই জ্বালিয়া মুখের নিবন্ত পাইপটা ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, আরে, তুই তো কানাই না?

কানাইয়ের মুখে চোখে হাসি দেখা দিল।

বছর দুই আগে একটা ফৌজদারী মামলার সম্পর্কে এই লোকটা তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিল। গিয়াছিল কতকটা মক্কেল হিসাবেই, কিন্তু পরে পরিচয় হয় যে, সে তাঁহাদেরই গ্রামের অনন্ত চৌকিদারের ছেলে কানাই। সেই পরিচয় পাইয়া প্রণতি তাহাকে কী ভুরি-ভোজটাই করাইয়া ছিলেন সেবার!

প্রণতি বলিলেন, তাইতো সত্যিই কানাই যে! তুমি আমাদের চিন্‌তে পারছ না কানাই?

কানাই সত্যই এতক্ষণে চিনিয়াছিল। সে সেই রাস্তার উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া দুজনের জুতা হইতে ধুলা লইয়া মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিল, আপনাদের চিন্‌তে পারবো না, মা! তা, এত দিন পরে বাড়ী এলেন, একটা খপরও কি আমাকে দিতে নেই মা?

প্রণতি একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বাড়ী কোথায়, কানাই? এখানে—

কানাই যেন আকাশ হইতে পড়িল।

—সেকি আজ্ঞে করচেন, মা! ঐ যে জোড়াতালগাছ দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে বড্ড জোর তিন-পো রাস্তা হবে বৈত নয়! ঐ তো আমাদের গাঁ দেখা যাচ্ছে।

প্রণতি নির্বাক হইয়া কানাই নির্দিষ্ট সেই জোড়া তালগাছের পানে চাহিলেন।

সুশান্ত বলিলেন, বলিস্ কি, কানাই? তা সত্যিই হবে বা! আমার তো একেবারেই খেয়াল ছিল না! কতদিন যে আসিনি, তার কি ঠিকানা আছে কিছু?

প্রণতি একটা অপরূপ খুসির হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু এসেছিলুম একবার, তুমি তখনো ফেরোনি লণ্ডন থেকে।···তাহলে, চল না আজ ঐখানেই!

—ওখানে? এখন? কেমন যেন একটা ভারী অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন মিঃ ঘোষাল।

কানাই বলিল, তাহলে আমি এক দৌড়ে চলে যাই, মা! যাবো আর আস্‌বো খান-দুই পালকী সঙ্গে নিয়ে।

প্রণতি হুকুম দিলেন, হ্যাঁ, তাই আনো, কানাই। কিন্তু বেশীক্ষণ যেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়, দেখো!

কানাই ছুটিল। উর্দ্ধশ্বাসে মাঠের উপর দিয়া ছুটিল।

সুশান্ত স্ত্রীকে বলিলেন,—ব্যাপার কি? সত্যিই, যাবে নাকি ওখানে?

—নইলে কোথায় থাক্‌বো এই মাঠের মাঝখানে শুনি? যেমন তোমাদের এই হতচ্ছাড়া গাড়ী। তার চেয়ে ঐ গরুর গাড়ীও ঢের ভালো।

শ্রীলা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া বলিল,—গরুর গাড়ীতে করে' কাশী যেতে ক'বছর লাগে মা?

প্রণতি ধমক্ দিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। স্বামীকে বলিলেন,—সে যাই বল, ও আর 'কিন্তু' করলে চল্‌বে না। শিবুকে পাঠাও মিস্ত্রীর খোঁজে, আর আমরা যাই ওখানে।

শিবু বলিল,—আর গাড়ী?

সুশান্ত বলিলেন,—অবশ্য, তার ভাবনা নেই। ঐ কানাইকে বল্‌লেই গাড়ীর পাহারার জন্যে আটকাবে না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই কানাই তুখানা পাল্কী লইয়া হাজির। একখানিতে শ্রীলা ও মণ্টু এবং অপরখানিতে তাদের জননীকে তুলিয়া দিয়া মিঃ ঘোষাল কানাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব হাঁটিয়া যাইবেন শুনিয়া কানাই চোখ কপালে তুলিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। ব্যারিষ্টার সাহেব কিন্তু বেহারাদের পাল্কী উঠাইতে বলিয়া পাইপ মুখে দিয়া আজ সিকি শতাব্দীর পরে পৈতৃক গ্রামের দিকে পা বাড়াইলেন।

পাল্কীর দরজা দিয়া প্রণতি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। তুপাশে আশ্বিনের ধানক্ষেতে সবুজের ঢেউ বহিতেছে, রাস্তার ধারে ধারে কাশের ঝোপের মাথায় রেশমের চামর তুলিতেছে।

এক জায়গায় খানিকটা বনতুলসীর ঘন সুগন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল। প্রণতির ইচ্ছা হইতেছিল, পাল্কী হইতে নামিয়া স্বামীর সঙ্গে তিনিও হাঁটিয়া যান। কিন্তু ছেলে মেয়েও তাহা হইলে হৈ হৈ করিয়া নামিয়া পাড়বে। সুতরাং সে ইচ্ছা দমন করিতে হইল।

গ্রামে ঢুকিবার মুখে বুড়ো বটতলায় অনেকগুলি লোক আসিয়া জড় হইয়াছে। তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া সুশান্ত তাহাদের মুখের পানে তাকাইতে লাগিলেন। হঠাৎ কি বলিবেন খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে একটুখানি কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন,— তোমাদের কাউকেই হয়তো আমি চিন্‌তে পার্‌বো না।

গ্রামবাসীদের দলের ভিতর হইতে একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল,—আমি কিন্তু চিন্‌তে পেরেছি একবার দেখেই। তাই তো এদের বল্‌ছিলুম, ওরে, উনি আজ যত বড়ই কেন হোন্‌ না, এই আমার সঙ্গে ওঁরও একদিন অমর্ত্ত পণ্ডিতের পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়েছিল। রক্ষাকালীতলার নারাণ চক্কোত্তিকে আপনার মনে পড়্‌চে না তো? অবিশ্যি, কেমন করেই বা পড়্‌বে!

তহাদের সঙ্গে-সঙ্গে সুশান্ত গ্রামের ভিতরে ঢুকিলেন। নারাণ চক্রবর্ত্তীর কথা আর ফুরায় না। অপর কেহ কোন কথা বলিয়া পরিচয় করিতে আসিলে সে তাহার মুখে থাবা মারিয়া থামাইয়া দেয়।

কানাই তো মহাব্যস্ত। চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া কি যে করিতেছে, কিছুই বোঝা গেল না।

প্রণতি বলিলেন, তাঁহাদের নিজের বাড়ীতে আজ থাকিবেন।

কানাই বলিল, তার যে আর কিছু নেই, মা! ঘরের মধ্যে পর্যন্ত অশথ গাছ গজিয়ে উঠেছে। দিনের বেলাতেও শেয়াল সেঁধোয়।

গ্রামের মধ্যে কখনো কোন বাহিরের অতিথি আসিলে পুঁজি একমাত্র দত্তদের বৈঠকখানা বাড়ী। সেইখানেই গালিচা সতরঞ্চি ও বালিশ বিছাইয়া বসিবার জায়গা হইয়াছিল। প্রণতি স্বামীকে

আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন,—বেডিংগুলো আনা হয়নি, কানাইকে ব'লে দাও ওগুলো নিয়ে আসুক।

ঘরের চারিপাশে এত ভিড় যে, প্রণতির অত্যন্ত অস্বস্তি লাগিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, চিড়িয়াখানার দরজাতেও ছেলে-মেয়েদের এত ভিড় হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু কানাই রক্ষা করিল। সে কোথা হইতে আসিয়া সব ভিড় পরিষ্কার করিয়া দিল এবং প্রণতিকে বলিল,—জিনিষ-পত্তর সব আন্‌তে পাঠিয়েছি মা। সব এলো ব'লে!

গালিচার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া সুশান্ত বলিলেন,—কী দুর্ভোগ বল দেখি?

প্রণতি হাসিয়া বলিলেন,—কেন? আমার তো এক্‌দম খারাপ লাগছে না! কাল সকালেই আমি যাবো আমাদের বাড়ীটা দেখ্‌তে। সে-বারে যখন এসে এখানে ছিলুম মাসখানেক, কী ভাবই হয়েছিল একটি মেয়ের সঙ্গে! আমারই সমবয়েসী হবে। নামটা কিন্তু একেবারেই ভুলে গেছি।

একটা ছোট্ট ছেলে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—ও বাড়ী থেকে মাসীমা এসেছেন।

সুশান্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—তা বেশ তো! আমি বরং একটু ঘুরে আসি। ওঁকে আসতে বল।

একটি প্রৌঢ়া গোছের বিধবা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। হাতে ধোঁয়া-পড়া এলুমিনিয়মের কেট্‌লি। তাহার পিছনে পিছনে সেই ছেলেটি গোটা তিনেক কাপ্‌ লইয়া আসিল। কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে রমণী বলিল,—গাঙ্গুলিদের কমলের সঙ্গে একদিন আপনার খুব ভাব হয়েছিল, না?

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, কমলই তো বটে! একদম্‌ ভুলে গিয়েছিলুম! কিন্তু আপনি কি করে'—

রমণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে হঠাৎ হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল,—কিন্তু এঁরা সব গেলেন কোথায় ?

সে কথার কোন জবাব না দিয়া প্রণতি খপ্ করিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—কী আশ্চর্য ! তুমিই কমল বুঝি ? এমনি হ'য়ে গেছ ?

—কি ? বিধবা হ'য়েছি ? সে তো যে বছর আপনি এসেছিলেন এখানে, তার পরের বছরই—কার্ত্তিক মাসে।

প্রণতি চুপ করিয়া রহিলেন। কি-যে বলিবেন সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না।

মেয়েটা হাসিয়া বলিল,—কিন্তু সে তো এক যুগের কথা ! ও-কথা মনে করে আমারই আর কোনো দুঃখ্যু আসে না। আর, সত্যিই, দুঃখ্যু করবারই বা কি আছে বল না, ভাই।

একটুখানি হাসিয়া আবার বলিল,—সে বার 'ভাই-ভাই' বলে এম্নি অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল,—তাই আজ মনে পড়ে গেল।

প্রণতি বলিলেন,—তা না-বলে আজ নতুন করে 'আপনি' ধরে থাক্লে আমি তো একদম্ আড়ি করে দিতুম !

শ্রীলা ও মন্টু ঘরে ঢুকিল। মন্টু উৎসাহ ভরে বলিল,—কি চমৎকার জিনিষ দেখেছো মা ! বলিয়া সে মায়ের সাম্নে একগোছা ধানের শীষ দোলাইয়া দিল।

প্রণতি বলিলেন,—ওমা ! এসব কোত্থেকে ছিঁড়ে আনলি রে ?

দরজা হইতে কানাই হাসিয়া জবাব দিল,—ও মা আমারই মাঠের ধান। খোকাবাবুর খুব ভাল লাগলো কি না !

—মা গো ! ভালো লাগলো ব'লে এই কচি ধানের শীষগুলো—কত ধান হ'তো ! এদের সঙ্গে তুমিও যে পাগল হলে, কানাই ?

ইহার পর কমলের একান্ত জিদে দত্তদের বৈঠকখানা হইতে গাঙ্গুলীদের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। খালি বাড়ী। ঘরগুলো বারোমাস চাবিবন্ধই থাকে। শুধু নীচের একটা কুঠরীতে থাকে কমল। সে ইহাদের জন্য উপরের ঘর খুলিয়া দিয়াছে এবং কানাই ইতিমধ্যে বিছানা, সুটকেশ ইত্যাদি এখানেই আনিয়া হাজির করিয়াছে।

কমলকে পাইয়া প্রণতি একেবারে জমিয়া গিয়াছেন। স্বামীকে বলিয়াছেন, পূজার কদিন কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না কিন্তু। স্বামী সে-কথার কোন জবাব দেন নাই।

নিজে একখানি গরদের লালপাড় সাড়ী পরিয়া এবং নূতন একখানি গরদের ধুতি কমলকে পরিতে দিয়া পরদিন দু'জনে একসঙ্গে পূজার মণ্ডপে গিয়া বসিলেন। গ্রামের মাঝখানে বারোয়ারী তলায় দুর্গোৎসব। স্বয়ং ব্যারিষ্টারগৃহিণী ভক্তিমতী পূজারিণী বেশে সেখানে আসিয়া বসিতে পূজা-মণ্ডপের আনন্দশ্রী যেন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে! পুরোহিত হইতে সুরু করিয়া ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন একটা নূতন উৎসাহের সঞ্জীবনী ধারা বহিতেছিল।

সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া কমল যখন কাপড় বদলাইয়া গরদের ধুতিখানি গুছাইয়া রাখিতেছিল, প্রণতি বলিলেন,—ওটা ভাই তোমারই থাক্। পূজোর কাজ-টাজ করার জন্যে দরকার লাগবে।

কমল হাসিয়া বলিল,—তাহ'লে সেবারকার কথাটা এখনো মনে আছে বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক না বুঝিলেও পরমুহূর্তেই কথাটা রীতিমত খোঁচার মত প্রণতির বুকে বিঁধিল। সেবারকার সেই নিবিড় ঘনিষ্ঠতার মাঝে একদিন এই মেয়েটি কথায় কথায় তাঁহাকে জানাইয়াছিল, গরদের সাড়ী পরিবার তাহার বড় সখ এবং প্রণতি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কলিকাতায় গিয়া তিনি নিশ্চয় তাহার জন্য একখানি ভাল গরদের সাড়ী

পাঠাইয়া দিবেন। কথাটা অত্যন্ত সহজেই প্রণতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু কমল মনে করিয়া রাখিয়াছে এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া। এবং সব চেয়ে নিষ্ঠুর হইয়া যে খোঁচাটা প্রণতিকে বিঁধিল, তাহা এই যে, সাড়ী পরার অধিকার এই মেয়েটির চিরদিনের জন্য শেষ হইয়াছে।

কমল তাড়াতাড়ি বলিল, তোমার মনে একটু কষ্ট দিলুম, না? মেমসাহেব হলেও এখনো ঠিক তেমনিই আছো দেখ্‌ছি। বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

প্রণতি একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিতে চাপিতে শুধু একটুখানি হাসিলেন।

কমল বলিল,—সত্যি, রাগ কর্‌লে না তো ভাই? আমরা একদম মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কি বল্‌তে কি বলি! অনেকদিন পরে একজন লোক পেলুম হেসে কথা কইবার, তাই কত কি যে বল্‌ছি তোমায়!

প্রণতির মনের মেঘ তখন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। হাসিয়া বলিলেন, কী আবার বলেছো! তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে জান্‌লে কাশীর মায়া ছেড়ে এখানে আসারই ব্যবস্থা কর্‌তুম্‌।

—ওমা! কাশী যাচ্ছো বুঝি তোমরা? তবে যে শুন্‌লুম—

—হ্যাঁ, কাশী হয়ে আরো অন্য যায়গায় যাবো।

—তা নাই বা গেলে! কটা দিন এখানেই থেকে যাও না!

প্রণতি হাসিয়া বলিলেন,—এবার আর হলো কৈ, ভাই! কিন্তু আস্‌বো নিশ্চয় সামনের বছরে। আজ থেকে তোমায় বলে রাখ্‌ছি। তার আগে আমার ঐ ভিটেটুকুর সংস্কার কর্‌তে হবেই—

কমল বলিল,—বাববা! কী বনই হয়েছে, দেখ্‌লে তো? শেয়াল তো থাকেই, বাঘ থাকাও আশ্চর্য নয়।

প্রণতি সেই দিন সকালেই দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিটার মর্মান্তিক ভগ্নাবশেষ। এবং বন কাটাইয়া ঐ সমস্ত

হাড়-বাহির-করা রাবিশগুলাকে ধূলিসাৎ করিয়া নূতন ইমারত গড়িবার একটা মোটামুটি কল্পনা তিনি মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছেন।

এদিকে, মিঃ ঘোষালকে গ্রামের নানা স্থান দেখিয়া বেড়াইতে হইতেছে। বহু দিনের পুরাণো ঐ শিবমন্দিরটা সংস্কার অভাবে এখন এমন হইয়াছে যে, বর্ষার সমস্ত জল শিবের মাথায় পড়ে। জেলা বোর্ডের কর্তারা দয়া করিয়া যে ইঁদারাটী দিয়াছিলেন, বিগত ভোটের সময় গ্রামের অনেকে তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করার জন্য না কি সেটা এখন এঁদো হইয়া পড়িয়া আছে। পাঠশালার ঐ কাঁচা ঘরখানার প্রায় সবই শেষ হইয়াছে, কিন্তু দেয়ালে খড়-মাটি দেওয়া এবং মেঝেটা পিটানোর অভাবে আজ বৎসরাধিক কাল ঐ অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। সুশান্তের মত কৃতী সুসন্তান যদি এসব দিকে একটু নজর না দেন, তবে আর কে দিবে? গ্রামবাসীদের এই সব অভাব-অভিযোগের প্রতি সুশান্ত বেশ সহৃদয় সমবেদনা জানাইলেন এবং তাঁহার যতটুকু সাধ্য তাহা তিনি নিশ্চয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় যদিও পূজার জন্য পাঠশালার ছুটী দিয়াছিলেন, তবু আজ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন এবং ঝাঁকড়া বকুলগাছটীর তলায় গ্রামের ছোট-বড় বহু লোককে জড় করিয়া একটি সভার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। সুশান্তকে এই সভায় সভানেতৃত্ব করিতে হইল। তিনি পাঠশালার উন্নতি কামনা করিয়া বক্তৃতা দিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়কে তারিফ করিলেন।

শ্রীলা কিন্তু যেন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। একবার মা ও একবার বাবাকে কেবলই সে তাগাদা দিতে লাগিল,—কখন যাবে এখান থেকে, বল না?

তাহার বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন রে? তোর ভালো লাগ্‌ছে না এখানে?

—জানিনে। বলিয়া শ্রীলা মুখ ভার করিল।

সুশান্ত হাসিয়া বলিলেন,—তাজমহল দেখ্‌বার জন্যে শ্রীলা ছট্‌ফট্‌ করছে।

প্রণতি হাসিয়া বলিলেন,—ভারী তাজমহল! কার একটা কবর দেখে তো সবই হবে!

শ্রীলা রাগ করিয়া বলিল,—তবে বাড়ী ফিরে চল।

—এই তো বাড়ী রে পাগ্‌লী! ঐ যে সকালে দেখালুম্‌ তোকে—

—ছাই! বলিতে বলিতে শ্রীলা সেই দুঃখের মধ্যেও না-হাসিয়া পারিল না।

পরের দিন সকালে শিবু গ্রামের ভিতরে আসিয়া খবর দিল, মোটর মেরামত করা হইয়াছে।

শ্রীলা ও মণ্টু নাচিয়া উঠিল। এখনই জিনিষপত্র বাঁধিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তাহারা বাবাকে তাগাদা দিয়া সম্মত করিল। কিন্তু, কমলের একান্ত জিদ্‌, আহারাদির সব আয়োজনই সে করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং—

সুতরাং এই কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া যাইতেই হইল। ঘরের ভিতর প্রণতি একা সুটকেশে কাপড় চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিলেন। কমল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে প্রণতির দেওয়া সেই গরদের কাপড়খানা বেশ পরিপাটী ভাঁজ করা। সে কহিল,—কাপড়খানা ভালো ক'রে কেচে-কুচে শুকিয়ে রেখেছিলুম। মিছে আমায় দিচ্ছো। এ তুমিই সঙ্গে নাও, ভাই। তার চেয়ে বরং —

—কি?

—যদি রাখো তো বলি।

—নিশ্চয় রাখ্‌বো। ;, ও কাপড়ের বদ্‌লি নয়। কি, বল না ?

—আমার অনেক দিনের সাধ, বিশ্বনাথ দর্শন কর্‌বো তোমরা যখন যাচ্ছো—

—ওমা, তা বেশ তো ! চল না !

—কিন্তু তোমরা যে মোটর গাড়ীতে যাবে ! আমার কি—তুমি বরং ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করো।

সে আবার ইহাদের আহারাদির যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু, সেই ব্যস্ততার ফাঁকে সকল সময় মন তাহার একান্ত উৎসুক হইয়া রহিল, প্রণতি আসিয়া কি বলেন শুনিবার জন্য। কিন্তু, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু প্রণতি ফিরিলেন না।

হঠাৎ যেন কমলের নিজেরই বড় লজ্জা করিতে লাগিল। ছিঃ ছিঃ ! কেন সে বলিতে গেল ! কাশী লইয়া যাওয়া কি সামান্য কথা ! সে যে এক অসাধ্য সাধন ব্যাপার ! বিশ্বনাথের দর্শন কি এত সহজেই পাওয়া যায় ? পাগল আর কাহাকে বলে !

অনেকক্ষণ পরে প্রণতি আবার কমলের কাছে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই কমল কি একটা নিশ্চিত ধারণা করিয়া ফেলিল। সুতরাং, ও-কথাটা যাহাতে আর না ওঠে, তাহার জন্য সে যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিল,—তাহলে ভাই, ছেলেমেয়েরা গেল কোথায় ? তারা ততক্ষণ খেয়ে নিলে না কেন ? গাড়ীর আর বেশী দেরী নেই বোধ হয় ?

প্রণতি ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তো মোটরে যাচ্ছি ভাই, তার আবার সময় কি ?

পরে একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, তা হ্যাঁ ! উনি বল্‌ছিলেন, সত্যিই তুমি যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে ?

—পাগল! কাশী যাবো বল্‌লেই কি যাওয়া হয়, বোন? আর তাও—তোমরা রেলে করে গেলেও বা কথা থাক্‌তো।

—হ্যাঁ, ঐ একটুখানিই তো খট্‌কা রয়েছে কি না! আর তুমি একা কিছু ট্রেণে—

—মাগো মা! সে আমি মরে গেলেও পার্‌বো না! মাথায় থাকুন বিশ্বনাথ! তিনি যেদিন টান্‌বেন—

সমস্যাটার যে এত সহজে এমন করিয়া মীমাংসা হইয়া যাইবে, তাহা প্রণতি একেবারেই আশা করেন নাই। তিনি মনে-মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তাহা যেন এতক্ষণে কাটিয়া গেল।

শিবু জিনিষপত্র গুছাইয়া গাড়ীতে তুলিয়াছিল। আহারাদি শেষ হইয়া গেলে প্রণতিদের মোটর গ্রামের বাহির হইয়া গেল।

ফেরার পথে আবার সেই বুড়ো বটতলা, সেই কাশের চামর আর বনতুলসীর গন্ধ!

যতক্ষণ দেখা যায়, কমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিল। তারপর মোটরের ক্ষীণতম শব্দটুকু যখন তাহার কাণে মিলাইয়া আসিল, তখন সে আস্তে আস্তে আবার বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ যেন তাহার কেমন চমক লাগিল।

বহুদিন হইতে এই বাড়ীখানিতে সে একাই থাকে। বাড়ীর মালিক যাঁহারা, তাঁরা কোন দিন এখানে আসেনও না, কোন খবর ও বড় রাখেন না। কি একটা কারণে নাকি গ্রামের ভদ্রলোকদের মধ্যেও তাহার তেমন মেলামেশা নাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে তাহার নিঃসঙ্গ জীবন যাত্রার ক্ষীণ ধারাটুকু। কিন্তু এই দুইটা দিনে হঠাৎ যেন কোথা হইতে বর্ষার প্রচুর জলস্রোত নামিয়া তাহাকে একেবারে উত্তাল করিয়া তুলিয়াছিল।

বাড়ীর উঠানে মানুষের পায়ের অনেকগুলি চিহ্ন ভিজা মাটীর উপর তাজা হইয়া আছে। যে দিকে তাকানো যায়, একটা যেন বিগত উৎসবের মৌন সজীবতা। রেশটুকু তার এখনো মিলায় নাই, কোন দিন মিলাইবে কি না কে জানে! প্রণতির মেয়েটি কোথা হইতে একরাশ শিউলি ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথিতে বসিয়াছিল, তাহারই অনেকগুলি ফুল এখনো রৌদ্রতপ্ত রোয়াকের উপর বিছানো। উঠানের পেয়ারা গাছটার ডালে মণ্টু একটা দড়ি ঝুলাইয়া দোলনা করিয়াছিল, বাতাসে সেটা আপনিই দোল খাইতেছে। দালানের চারিদিকে উহাদের উচ্ছিষ্ট বাসন ক'খানা পড়িয়া। একটা বিড়াল জানালার কাছে বসিয়া তাহারই দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বারোয়ারী পূজার তলায় ঢোল কাঁসি আর সানাইয়ের সঙ্গীতে আজ হইতেই যেন কে বিসর্জনের স্থর ঢালিয়া দিয়াছে!

তাহার নিজের খাওয়া এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু, সেদিকে তাহার আজ বিন্দুমাত্র উৎসাহও নাই। দালানের একপাশে খালি মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িল। নিদারুণ অবসাদে শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কাণে যেন তখনও বাজিতেছে প্রণতিদের মোটরের শব্দ। এতক্ষণ কত দূর গিয়াছে তাহারা? কাশী পৌঁছিতে কত দিন লাগিবে? এমনই কত এলোমেলো প্রশ্ন মনে আসিতেছে।

ও-দিকে, প্রণতিদের মোটর তখন মাঠের পর মাঠ ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।

প্রণতি স্বামীকে বলিতেছিলেন,—ভাগ্যে মোটরটা খারাপ হয়েছিল! বড় ভালো লাগলো এবার গ্রামে গিয়ে। কল্‌কাতায় ফিরেই কিন্তু এবার আমার প্রথম কাজ হবে, এখানকার বাড়ী তৈরী করানো। তা এখন থেকে ব'লে রাখছি।

শ্রীলা বলিল,—এ মোটরখানা একদম অকেজো হয়েছে, বাবা। অনেকদিন থেকে বলে রেখেছেন আপনি, একখানা 'নিউ মডেল' গাড়ী কিনবেন। এবার কিন্তু কিন্‌তেই হবে।

মিঃ ঘোষাল পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—গ্রামে দু'এক দিনের জন্যে এসে অবিশ্যি মন্দ লাগে না, কিন্তু ঐ পর্যন্তই! এই বিজ্ঞানের যুগে গ্রামের প্রতি অতিরিক্ত মমতার কোন মানেই কিন্তু হয় না। ওটা নিছক মোহ।

প্রণতি বলিল,—হোক মোহ! চমৎকার লাগলো কিন্তু আমার। বিশেষ করে ঐ কমলকে। কত মেয়েরই তো সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু, ও যেন···কী যে আপশোষ হচ্ছে ওকে সঙ্গে আন্‌তে পারলুম না বলে!

সুশান্ত একটু হাসিয়া নীচু গলায় বলিলেন, কিন্তু গাঁয়ে ওঁর যে সুনাম শুনলুম, তাতে না এনে ভালই হয়েছে বোধ হয়।

প্রণতি বলিলেন, কেন? কে কি বল্‌লে তোমায়? সত্যি বল্‌লে? ···কখ্‌খনো না! অমন কত কথা মিথ্যে রটায় লোকে।

স্বামী আর কোন জবাব দিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রণতি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিতে চাপিতে আপনারই মনে অস্ফুটে বলিলেন, তা, সত্যি-মিথ্যে কে-ই বা বল্‌তে পারে!

অন্তরের যে সুদৃঢ় বিশ্বাস কিছুক্ষণ আগে বেশ জোরের সহিত প্রতিবাদ তুলিয়াছিল, এখন হঠাৎ যেন মনে হইল, আসলে সে বিশ্বাসের কোন ভিত্তিই তো নাই! তাহার বিরুদ্ধে কোন কুৎসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, এইমাত্র। কিন্তু, সত্যই অবিশ্বাস করিবার মত কিই বা তিনি জানেন! সত্যকার কতটুকু পরিচয়ই বা তার পাইয়াছেন!

শ্রীলা বলিল,—আগ্রাতে নিশ্চয় কৃষ্ণাদের সঙ্গে দেখা হবে, না বাবা?

তাহার বাবা বলিলেন, হ্যাঁ, তাদেরও তো ঐ সময় আগ্রায় আস্‌বার কথা। পরে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—মিসেস্ দেশাইয়ের ভারী সাধ যে আমরাও—অর্থাৎ তুমিও তাঁদের সঙ্গে যাও। তাঁর মতে মনের মত সঙ্গী না থাকলে নাকি চাঁদনী-রাতের তাজ দেখে আনন্দ পাওয়া যায় না।

প্রণতি একটুখানি ক্লান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন,—আমাকেও তাই ব'লেছিলেন। তাইতো শেষে ঠিক হলো যে, পূর্ণিমার আগের দিন দু'জনেই দুদিক থেকে আগ্রায় পৌঁছুব। চমৎকার লোক কিন্তু মিসেস্ দেশাই! কে বল্‌বে, বাঙ্গালী নয়!

···মনের আঙ্গিনায় নূতন বাতাস লাগে। তাহার সঙ্গে ভাসিয়া আসে নূতন রূপ-রস-বৈচিত্র্যের আবেশ। বনতুলসীর ঘন গন্ধ যেন কেমন ঘোলাটে এবং ফিকে হইয়া আসে।

মোটর তীরগতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া ছুটিতেছে। সেই গতির সম্মুখে বিশাল ধরিত্রী যেন তাহার সহস্র সিংহদ্বারের যবনিকাগুলি এক একখানি করিয়া তুলিয়া ধরিতেছে। এই তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের মাঝখানে সেই ছোট একখানি গ্রাম আর তাহারই বুকের উপর ঐ নগণ্য এক পল্লীনারী কোথায় যেন তলাইয়া যাইতেছে, ক্ষুদ্রতম বিন্দুর মত যেন আর তাহা নজরে পড়ে না।

* * *

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে কমল স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন প্রণতিদের সঙ্গে সেও কাশীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কাণে তার ভাসিয়া আসিতেছে বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতির ঢোল-কাঁসি আর সানাইয়ের মিশ্রিত ধ্বনি।

জানালার বাহিরে নৃত্যপাগল বৈশাখের ভৈরব মূর্তি দেখা দিয়াছে। সামনের ঐ ধনীর বাগানের নারিকেলগাছগুলা এ-ওর গায়ের উপর চলিয়া পড়িতেছে। সারাদিনের প্রচণ্ড দাহের পর কয়েক ফোঁটা জলের আশায় সমস্ত প্রকৃতি যেন সত্যই মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

কোলের ছেলেটা সারাদিন দাপাদাপি করিয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছে, এখনই উঠিয়া খাবার চাহিবে। ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া অণিমা অবসন্ন ক্লান্তিতে শুধু তাহারই প্রতীক্ষায় মেঝের উপর পড়িয়া খোলা জানালাটা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল।

কালবৈশাখীর সেই মামুলী হুঙ্কার,—তবু তাহাতে নূতনত্ব ছিল অনেকখানি। অণিমা তাই মেঝে ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের উন্মত্ত ঝড়ের পানে চাহিয়া সে যেন তন্ময় হইয়া গেল—অনেক কিছুই মনে করিয়া।

ঠিক কি যে তাহার মনের মাঝে দেখা দিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে নিজেও সে গুছাইয়া বলিতে পারিত না। একসঙ্গে কিন্তু অনেকদিনের অনেক কথাই তাহার মনের নীড়ে ভিড় জমাইয়া আসিল।

আজিকার এই ঝড়ের দিনটি যেন বহুদিনের দেখা পুরাণো বন্ধুটির মত তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহিল। জানালার গরাদের সামনে দাঁড়াইয়া অণিমা তাই তাহারই সহিত মুখোমুখি নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়াই রহিল।

হ্যাঁ—বহুদিনের দেখা বন্ধুই ত! সে তখন বারো বছরের মেয়ে। পাড়ায় 'ডান্‌পিটে' বলিয়া একটা সুনাম ছিল। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ, ইহারা ছিল তাহার প্রাণের বন্ধু। এমনই কালবৈশাখীর ঝড়ের মাঝখান দিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে আমতলায় ছুটিত—মাথার উপর মেঘ ডাকিত, ছোট হাত দু'খানা চাপিয়া সে মাথা বাঁচাইত। সেবার বাকুলীদের আমবাগানে—মা গো মা, কী কাণ্ড! প্রকাণ্ড একটা গাছ হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, একেবারে তাহার সামনেই! এমনি ভয় হইয়াছিল! একেবারে ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। কতক্ষণ যে মাথা তুলিতে পারে নাই, কে জানে! মা যত সুধান, কি হয়েছে? সে বলে, কিচ্ছু না! মা গো! সে কথা শুনিলে মা কি আর পিঠের চামড়া আস্ত রাখিতেন!

আজও সেই কালবৈশাখী! আজও যেন ঐ ধূলির গেরুয়া উড়াইয়া পাগলা বাতাস তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বলিতেছে যেন, ওরে পাগলী, আবার ত সেই আমিই ফিরিয়া আসিয়াছি, তোর কিন্তু দেখা নাই কেন? তোর আজ হ'ল কি?

পাগল আর কাকে বলে! সেই অণিমা আর এই অণিমা? কোনদিক দিয়াই তাহাদের মিল থাকিতে পারে না যে! আজ সে দুইটি সন্তানের জননী। সে বলিতে তাহার ঐ দুটি ছেলেমেয়ে, আর তাহার ছেলে-মেয়ে বলিতেই সে! তা ছাড়া আর কোনও সত্তাই যে তাহার নাই!

স্বামী কাছারী গিয়াছেন সেই কোন্ সকালে। মেয়েটা তাঁহার সহিত দুটি ভাত খাইয়াছে, এখনই উঠিয়া ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিবে। তাহাকে খাওয়াইয়া, মুখ-হাত মুছাইয়া, জামা পরাইয়া, খেলিতে পাঠাইয়া দিতে দিতেই ছেলে উঠিয়া কান্না জুড়িয়া দিবে। তাহাকে দুধ খাওয়ানো—কাজল পরানোর পর্বটুকু শেষ করিতে না করিতেই স্বামী কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিবেন—তাহার কি ছাই সময় আছে?

কোনও কিছু ভাবিবার সময় আছে, না, কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি দেখিবার সময় আছে ?

সময়ও নাই, বয়সও বুঝি নাই। আজ সে দস্তুরমত একজন গৃহিণী, তা হোক না, বয়স তার মোটে একুশ! ছোট্ট এই বাড়ীখানির সজীব নির্জীব প্রতিটি বস্তু তাহার গৃহিণীপনাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। তাহার স্বামী—বুকভরা তাঁহার ভালবাসা। আর ঐ দুটি ছেলেমেয়ে, তাদের চাঁদমুখের অমল হাসি—এই ত তাহার অবলম্বন, এই ত তাহার জীবনের চরম কামনার বস্তু! অণিমার মত সুখী কে ?

আবেগের মুখে অণিমা ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মুখে চুমা দেয়। ছেলে ঠোঁট কাঁপাইয়া হাসে। মেয়ে মায়ের ঠোঁটের স্পর্শে জাগিয়া ওঠে। মা তাহাকে আদর করিতেছে দেখিয়া সে একেবারে দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরে।

অণিমা তাহার মাথার চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে বলে—বাবা, তোর কি ঘুম রে, ছবি! দেখ্ দিকি, কি রকম ঝড় উঠেছে! আমার একা ভয় করে না রে ?

মেয়ে তার যা-হয় একটা উত্তর দেয়। মাও পাল্টা জবাব দেয়। এমনিভাবে চলে মা ও মেয়ের ছোট একটু স্নেহের পর্ব।

প্রতিদিনের মত সেই রাঁধা-বাড়া খাওয়ানো এবং খাওয়া। খুব খানিকটা ঝড়ের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হইয়া আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া গেছে। কিন্তু সেই কোন্ মরা-দিনের কালবৈশাখীর স্মৃতিটুকু অণিমার বুকের নীচে যে মেঘসঞ্চার করিয়াছিল, তাহা আজ সহজে পরিষ্কার হইতে চাহিতেছে না। অভ্যস্ত কাজগুলির ফাঁকে-ফাঁকে তাই কে জানে কোথাকার এক একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাস তাহার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসহ্য গুমোটের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে।

পাড়ার কোন্ বন্ধুর বাড়ীতে তাস-খেলা শেষ করিয়া সুখেন যখন বাড়ীতে ঢুকিল, অণিমা তখন রান্না সারিয়া ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের পাশে পড়িয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুখেন নিদ্রিতা বধূর ছোট্ট ললাটের উপর চুম্বন দিয়া ডাকিল,—ওগো, ওঠো, ওঠো, ভারী খিধে পেয়ে গেছে!

অণিমা হাই তুলিয়া গা-ভাঙ্গিয়া বলিল, বাবা রে বাবা—আজ আর উঠ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না একেবারেই—

সুখেন হঠাৎ বিরক্ত হইয়া উঠিল।

—তা মন্দ নয়। তা হ'লে মুখ-হাত ধুয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়া যাক্!

স্বামীর ঝাঁজ লাগিয়া অণিমার ঘুমের আমেজ একেবারে কাটিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, বাবাঃ! তাই যেন বলেছি আমি!—একটু শুতে দেখলেই তুমি একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠো!

সুখেন মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, হ্যাঁগো, ওঠে অগ্নিশর্মা হয়ে! যে দারুণ খিধে পেয়েছে—তাই ত বলছি!

অণিমা ভাত বাড়িতে বসিল। ছোট্ট সুন্দর মুখখানিতে—চোখের পাতায় ঘুমের রেশটুকু তখনও ভারী হইয়া বসিয়া। মুখখানি তার অতিমাত্রায় গম্ভীর দেখাইতেছিল। ভাতের থালার আশায় উবু হইয়া বসিয়া সুখেন বলিল, কি একটা কথা বলেছি, অমনি রাগ হয়ে গেল!

অণিমা জবাব দিল না। সুখেন বলিল, তবু কথা কইছো না যে?
—যে কথা না কয়, সে—সে—

অণিমা চোখ পাকাইয়া বলিল, খবরদার, দিব্যি দিও না বলছি—

—না, দেবে না!—সে—সে—

—যে দিব্যি দেবে, সে আমার মাথা খাবে—

সুখেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, ইস্, ভারী ইয়ে আর কি !

অণিমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, ইয়ে আবার কি ? কেমন হয়েছে ! দাও দিব্যি ! দাও না, দাও—কেমন জব্দ !

বলিতে বলিতে সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, ক্ষণপূর্বের অভিমানের মেঘ ঐ অমল হাসির ধারাতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সুখেন মুগ্ধচোখে তাহার ঐ হাসিটুকু দেখিতেছিল। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া অণিমা তাহার কাছে ভাতের থালা আগাইয়া দিয়া বলিল, খিধে পেলে বুঝি মানুষ অম্‌নি পাগলের মত হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে ? খাও না !

সুখেন যেন একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, খাই।—তোমার ঐ হাসি দেখ্‌লে খিধে-তেষ্টা সব মেটে কি না, তাই তাকিয়েই ছিলুম !

অণিমা বলিল, তবে আর কষ্ট ক'রে রাঁধ্‌বো না কাল থেকে, কেমন ?—আজ তোমার জন্যে ডাল-বাটা ভাতে দিয়েছি, খেতে হবে সবটুকু, নষ্ট করলে মজা টের পাবে।

সুখেন কথা কহিল না, খাইতেই লাগিল। অণিমা বলিল, এবার বুঝি চাকা ঘুরে গেল, তাই বাবুর মুখে আর রা-টি পর্যন্ত নেই ?

সুখেন হাসিয়া বলিল, দূর্ ! আমি কথা কইব না ? আমি শুধু ভাবছি—কি ভাবছি জানো ?

—কি ?

—ভাবছি, তুমি আর আমি কত আকাশ-পাতাল তফাৎ !

—তার মানে ?

—মানে আর কিছু না। আমি সেই সন্ধ্যে থেকে রাত ন-টা পর্যন্ত তাস পিটে বাড়ী ফির্‌লুম, আর তুমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছ ব'লে—তাতেও তোমার একটু বিরক্তি নেই—এতটুকু রাগ অভিমান—

অণিমা হাসিতে গিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল,—রাগ অভিমান করলেই বুঝি সব জিনিষের মীমাংসা হয়ে যাবে ?

—তা ত যাবে না সত্যি। কিন্তু অত হিসেব-কিতেব ক'রে কেউ রাগ-অভিমান করেও না ত !—এই ছোট্ট বাড়ীখানার ভেতর সেই যে কবে তোমায় এনে বন্দী করেছি, এখান থেকে আর পা বাড়াবার যো-টি রাখিনি !

অণিমা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, তার মানে, কথাটা সেদিন আমিই বলেছিলুম ব'লে আজ তাই নিয়ে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে !

—খোঁটা দিচ্ছি ?

সুখেন যেন হঠাৎ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—তুমি আমায় এত হীন মনে কর, অণু ? আমার আর কিছু থাক্ না থাক্, এই মোটা অনুভূতি—যা পশুরও বুঝি আছে—তাও নেই মনে করেছ ? আমি সব বুঝি—সব ভাবি—

অণিমা বাধা দিয়া বলিল, বেশ গো বেশ। খেতে-খেতে এমন ক'রে বক্‌লে খাওয়াও হবে না, গলায় লেগে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে।

বাধা পাইয়া সুখেন বিনা বাক্যব্যয়ে আহার শেষ করিয়া উঠিল।

সুখেনের বন্ধু অমলের স্ত্রী আসিয়াছিল বেড়াইতে। অণিমা তাহার অভ্যর্থনা করিতে গিয়া একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার এই সময়টা তাহার ঝঞ্চাটের শেষ নাই। সবে মসলা-বাটা সারিয়া লইয়া তোলা উনানের উপর তরকারী ফুটিতে দিয়া সে ময়দা মাখিতে বসিয়াছিল, এমন সময় ছবি ছুটিয়া আসিয়া চাপা-গলায় বলিল,—কে এসেছে মা।

অণিমা হতবুদ্ধির মত ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া বলিল,—কে রে ?

ছবি কিছু বলিবার আগেই অমলের স্ত্রী একেবারে ঘেরা-দালানের দুয়ারে আসিয়া বলিল, এমন মারাত্মক কেউ নয় যে, ভয়ে আঁৎকে উঠতে হবে। আপনারই মত একজন—

অণিমা রীতিমত অপ্রতিভ হইয়া গেল। সেই ময়দা-মাখা হাত দুটীকে কি করিয়া সামলাইবে, কোন-কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সেই অবস্থাতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আসুন, আসুন—

অমলের স্ত্রী তাহার ছোট ননদটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। তাহারই মুখ দিয়া পরিচয়টা হইয়া গেল। অণিমা যেন আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কারণ, সে বরাবরই জানিত, অমলবাবুরা বেশ বড় লোক। তাহাদের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার কোন দিক দিয়াই যে তুলনা করা চলে না! এই সংজ্ঞাটুকুই অণিমাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি সে হাতদুটি ধুইয়া ফেলিতে ফেলিতে অত্যন্ত উদ্বেগের স্বরে বলিল, দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন ছবি, দে না মাদুরখানা পেতে!

দেয়ালের গায়ে একখানা সিঙ্গাপুরী মাদুর পাক-দেওয়া অবস্থায় দাঁড়-করানো ছিল, ছবি তাহার ছোট্ট হাত দুটি দিয়া টানিয়া লইয়া যথাসাধ্য যত্নে সেটাকে উল্টা করিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিল।

অমলের স্ত্রী ততক্ষণে চারিদিকের জিনিস-পত্র দেখিতেছিল। হাত-ধোয়া শেষ করিয়া অণিমা তাড়াতাড়ি আসিয়া ছবিকে কনুইয়ের গুঁতা দিয়া সরাইয়া দিয়া মাদুরখানা সোজা করিয়া পাতিয়া দিতে-দিতে নীচু গলায় বলিল, মেয়ের দ্বারা যদি এতটুকু একটু কাজ হবার যো আছে!

অমলের স্ত্রী বসিয়া বলিল, তবু যা হোক্‌ ভাগ্যিস্‌ এলুম, তাই আলাপটা হ'ল। আপনি ত একদিনও গেলেন না!

অণিমা মুখের উপর অনেকটুকু হাসি ফুটাইয়া বলিল,—রোজই মনে করি ত যাব, কিন্তু—

অমলের স্ত্রী বলিল,—ব্যাস্, ঐ এক 'কিন্তু'! ও 'কিন্তু'র আসলে কিন্তু কোনো মানেই নেই। না, তা কেন, আছে শুধু একটা মানে। বল্‌ব ?

অণিমা বলিল, কি, বলুন না ?

—কর্তাটিকে ছেড়ে কোথাও যেতে মন আর আপনার ওঠে না।

অণিমা হাসিয়া ফেলিল। পরে বলিল, কর্তা বুঝি আমার কাছে ব'সে আছে দিন-রাত ?

—তবে ? আমি ত ওঁর সব বন্ধুর বাড়ীতে যাই, সকলের কাছেই শুনি, আপনি কখনও কারু বাড়ী যান্ না। আচ্ছা কুণো কিন্তু আপনি।

অণিমা একবার একটু গম্ভীর হইয়া তখনই আবার হাসিল। বলিল, কি ক'রে যাই বলুন না! ছেলেপুলে নিয়ে—

অমলের স্ত্রী বলিল,—আহা-হা, ছেলে বুঝি আমাদের নেই ? না, সংসারের কাজকর্ম আমরাও কিছু করি নে ?—সত্যি, সবাই বলে, আপনি বাড়ী থেকে বেরোতে চান্ না একেবারে! কর্তা পছন্দ করেন না বুঝি ?

—তা কেন! উনি ত কেবলই বলেন যাবার জন্যে—

—তা হ'লে আপনারই যাওয়া হয়ে ওঠে না ? বুঝেছি!

অণিমা হাসিয়া বলিল,—না, সত্যি, এবার যাব এক দিন, দেখবেন—

—কবে ?

—কবে, তা আজই বল্‌তে পারছি নে। শীগ্‌গীর যাব—

উহারা চলিয়া গেলে অণিমা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার

রুটী-গড়ার দিকে মন দিল। হঠাৎ তাহার মনটা কি-জানি-কেন অনেকখানি তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল।

উনানটা পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইবার যোগাড় হইয়াছে, রুটী-কখানাও বুঝি আর ভাল করিয়া সেঁকা হইবে না। ওদিকে ছবি দেয়ালে ঠেস্ দিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে মেঝের উপরই পড়িয়া চোখ বুজিয়াছে। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে মেয়ে আর সারারাত কিছুই খাইবে না। ছেলেটা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছে, দুধ খাওয়ানোর সময় বহিয়া যাওয়ায় এখনই উঠিয়া চীৎকার করিবে। অসহ্য বিরক্তিতে অণিমার যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

—আ মলো যা! এখুনি ঘুমুচ্ছিস যে বড়? গিল্‌তে হবে না বুঝি? না, সাতটা চাকরাণী আছে তোমার যে উঠিয়ে খাওয়াবে! ওঠ্ বল্‌ছি, নইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

ইতিপূর্বেই অকারণে মায়ের নিকট ধমক্ এবং কনুইয়ের গুঁতা খাইয়া ছবির মনখানি অভিমানে ভারী হইয়াছিল। দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু তখনও বুঝি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। এখন আবার মায়ের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে সে তাহার ঘুমে-ভারী চোখের পাতা দুইটি একবার খুলিতে পারিল মাত্র, উঠিয়া বসিবার শক্তি তাহার ছিল না।

মেয়ে উঠিল না দেখিয়া অণিমা নিজেই উঠিয়া গিয়া প্রবল হ্যাঁচ্‌কানিতে তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিল।

—ব'সে থাক্ চুপ ক'রে, যতক্ষণ না রুটী হয়। কী আমার নবাব গো! ন-টা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে পড়্‌লেন!

ছবি চীৎকার করিল না। একবার মায়ের অগ্নিমূর্তির পানে চাহিয়াই স্তব্ধের মত বসিয়া রহিল। শুধু একবার সেই সুন্দর কচি

মুখখানি রেখায়-রেখায় কুঞ্চিত হইয়া দর্‌দর্‌ করিয়া চোখের জল গাল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মেয়ের চোখের জল দেখিয়া অনিমার নিজের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখনই সে আপনাকে সংযত করিল। কাঁদিবার কি-ই বা আছে? এই-ই ত তাহার সংসার! আর, এমনই অকারণে অনাদর—নির্যাতন সহ্য করিবে বলিয়াই ত ঐ হতভাগিনী তাহার গর্ভে স্থান লইয়াছে! কিছু নাই—দুঃখ করিবার কিছু নাই!

অনিমা উনানের উপর তাওয়া চাপাইয়া রুটী সেঁকিতে দিল। বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে একাধিক লোকের জুতার শব্দ পাওয়া গেল। অনিমার নির্দেশমত ছবি গিয়া দরজা খুলিয়া দিল, কিন্তু পাছে তার বাবা তার চোখের জল দেখিতে পান, সেই জন্য একেবারেই না দাঁড়াইয়া বরাবর ভিতরে চলিয়া আসিল।

বাড়ীর ভিতর দিকের দরজার নিকট হইতে কে একজন বলিল,—ও বৌদি! দু'জন শাঁসালো মক্কেল এসেছে। যদি কিছু মনে না করেন ত দু'কাপ চা—

সুখেন ভিতরে আসিয়া অনিমাকে বলিল, ওগো, নন্দ আর শৈলেন এসেছে, দু'কাপ চা হয়ে উঠবে কি?

অনিমা মুহূর্ত-মাত্র নীরব থাকিয়া খুব ছোট করিয়া বলিল, দিচ্ছি।

মেয়ের দিকে চাহিয়া সুখেন বলিল, ছবি কাঁদ্‌ছে কেন?

অনিমা জবাব না দিয়া কেট্‌লীটা উনানে বসাইয়া দিল।

বাহির হইতে নন্দ বলিল, কি বাবা! আমাদের বসিয়ে রেখে রসালাপ সুরু ক'রে দিলে যে!

সুখেন হতভম্বের মত মুহূর্তমাত্র চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া একবার মেয়ের এবং অনিমার পানে তাকাইয়া দেখিয়া ধীরে-ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

নন্দ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, দিব্যি আছ বাবা দুটিতে! তোমাদের দেখেই বোধ হয় চক্রবাক-চক্রবাকীর উপমাটার সৃষ্টি হয়েছিল!

শৈলেন গম্ভীর হইয়া বলিল, সাধে কি আমি বলি যে, সুখেন গীতগোবিন্দের একটা প্রাকটিকেল এডিসন্ বার করবে? কি বলিস্?

সুখেন বলিল, হুঁ।

তাহার বিভ্রান্ত মনের চোখে তখন ভাসিতেছে শুধু ছবির সেই অশ্রুম্লান মুখ এবং অণিমার থম্‌থমে ভাব। প্রচুর বর্ষণ নামিবার আগে মেঘলা আকাশের বহুদূরব্যাপী স্তব্ধতা!

চায়ের মজলিস্ শেষ করিয়া সুখেন যখন দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে গেল, তখন অণিমা ঘুমন্ত খোকাকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে বসিয়াছে, মুখে-চোখে খানিকটা জল মাখিয়া ছবি ঘুম-জড়ানো চোখে খাবারের থালার সামনে বসিয়া অতি বড় শাস্তির মতই রুটী চিবাইতেছে। একপাশে থালার উপর কতকগুলো কাঁচা রুটী পড়িয়া আছে। বাহিরে তোলা উনান হইতে সদ্যপ্রক্ষিপ্ত কয়লার ধোঁয়া মাঝে মাঝে দালান-ঘরের ভিতর পর্যন্ত আসিয়া ঢুকিতেছে।

সুখেন ছবির কাছে বসিয়া বলিল, এ কাঁদছে কেন গো? মেরেছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আহা-হা, মারো কেন?

অণিমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিল।—খুসী হয় বলেই মারি। একটা দিন আমায় ছুটী দিয়ে দেখ না, কেন মারি।

সুখেনও উষ্ণ হইয়া বলিল, তোমার খালি ঐ এক কথা। ছুটী দাও না। ছুটী কে কাকে দিতে পারে? তুমি পার আমায়?

অণিমা কোন জবাব না দিয়া ছেলেকে তুলিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিল। সুখেন বলিল, ছুটী সত্যিকার হবে সেই দিনই—

অণিমা গলা চড়াইয়া বলিল, ওগো, তোমার পায়ে প'ড়ে বল্ছি, আজ আর কথা বাড়িও না। পার ত' মেয়েটাকে রুটীখানা গিলিয়ে শুইয়ে দাও গে!

কৃষ্ণপক্ষের শেষদিকের কোন্ একটা তিথি। অন্ধকার যেন চারিদিকে বিপুল ডানা ছড়াইয়া সারা পৃথিবীটা জুড়িয়া আছে। আকাশে রাশি রাশি তারা, তাহাদের প্রতিটি প্রেক্ষণে কি এক অনির্বচনীয় রহস্যে-ঘেরা ইঙ্গিত। গ্রীষ্মের বাতাস খেয়ালী শিশুর মত আপনার উন্মাদনায় আপনিই চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে; কখনও জানালা গলিয়া ঢুকিয়া অণিমার রুক্ষ কোঁকড়া চুলগুলি উড়াইয়া খেলা করিতেছে।

লোহার গরাদেগুলির উপর মুখখানি চাপিয়া অণিমা দাঁড়াইয়াছিল —নীরব, নিশ্চল, নিস্পন্দ। রাত্রি গভীর হইয়াছে; কোথাও এতটুকু জাগরণের সাড়া পাওয়া যায় না। অণিমার সারা দেহেও যেন চেতনার লক্ষণ নাই।

অণিমা খুঁজিতেছিল, কোন্খানে কি তাহার ব্যথা? কিসের দুঃখ তাহার? নিজের কাছেই সে কেন তাহার চেহারাটাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারে না? অথচ, সেই অনির্দিষ্ট বেদনার অস্পষ্ট অনুভূতিতে তাহার দেহ-মন পঙ্গু হইয়া উঠিল যে!

বিছানার উপর স্বামী এবং ছেলেমেয়ে অকাতরে ঘুমাইতেছে। সে কেন ঘুমাইতে পারিতেছে না? কেন প্রতিদিনের মত তাহাদের গায়ে গা-ঘেঁসিয়া—তাহাদেরই মাঝে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া অনুদ্বিগ্ন গভীর শান্তিতে সে ঘুমাইতে পারিতেছে না?

বাতাস তাহার কাণের পাশ দিয়া পাগলের মত খানিকটা হাসিয়া

গেল। আকাশে তারাগুলা পর্যন্ত যেন হাসিয়া উঠিল। সামনের একটা তারা কী উজ্জ্বল হইয়াই জ্বলিতেছে! কি যেন ও বলিতে চায়! কী সে অনুক্ত বাণী? ও কি ওর ঐ প্রদীপ্ত চোখের ইসারায় বিশ্বের সমস্ত দুঃস্থ মানব-মনকে ডাক দিতেছে? কোথায় ডাকে? কেনই বা ডাকে?

সামনের খোলা জায়গার একধারে একটা লাইট পোষ্টের উপর কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে, তাহারই ফিকে আলোটুকু মাঠের ঘাসের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভিজে মাটীর অস্পষ্ট গন্ধ অণিমার নাকে আসিয়া লাগিতেছে, কি যেন অনির্বচনীয় সঞ্জীবনী ঐ গন্ধে মাখা!

অণিমার মনে হইল, একবার ঐখানে—ভিজে-মাটীর গন্ধমাখা ঐ ঘাসের উপর হাত-পা ছড়াইয়া বসিতে পারিলে কেমন হয়? চমৎকার বাতাস! মাথার উপর ঐ আকাশ, ঐ তারা—সারাটা রাত সে ঐ তারা গণিয়া গণিয়াই কাটাইয়া দিতে পারে।

কাণের কাছে কাহার গরম নিশ্বাস পাওয়া গেল। অণিমা শিহরিয়া উঠিল। সুখেন বলিল, ভয় নেই, আমি। এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে? ঘুমোও নি?'

—ঘুম আসছে না কিছুতেই।

পরে সুখেন কিছু বলিবার আগেই বলিল, আচ্ছা, আমায় একবার ঐখানে—ঐ ফাঁকা মাঠের ওপর নিয়ে যেতে পার? এখন কেউ ত দেখ্‌তে পাবে না!

বিস্ময়ের সুরে সুখেন বলিল, ছেলেদের ফেলে রেখে তুমি যাবে?

অণিমা নিজেরই ভিতর খুব বেশী অপ্রতিভ হইয়া কহিল, দূর, তাই আবার যায় না কি?

সুখেন বলিল, তার চেয়ে চল, ছাদে গিয়ে একটু বসি।

অণিমা একটু ভাবিয়া বলিল, না, থাক্। ছাদের তিন পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলো যে রকম মাথা উঁচু ক'রে আছে, তাতে মনে হয়, তারা যেন আমাদের ঐ ছাদটাকেই পাহারা দিচ্ছে। তার চেয়ে ঘরের মধ্যেই ভাল। ঘরের দেয়ালগুলো ত পাহারা দেয় না, সোজা-সুজি আটক্ করেই রাখে। পাহারাগুলোকে আমার বড্ড বেশী ভয় করে।—বলিতে বলিতে যেন নিজের রসিকতায় সে হঠাৎ উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। সে হাসির বেদনায় বাহিরের বাতাসও যেন মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সুখেন হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, তুমি বরং এবার দিনকতক বাপের বাড়ী যাও অণু। কেমন ?

অণিমা হাসিয়া বলিল, কেন বল ত ? ভাব্ছো, এখানে আমি খু—ব কষ্টে আছি, আর সেখানে খু—ব সুখে থাক্বো ? কিন্তু মা মারা যাবার সঙ্গেসঙ্গেই যে সেখানকার সম্বন্ধ আমার চুকে-বুকে গেছে !

সুখেন স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। বিবাহের পূর্বে ছেলেবেলা হইতেই সে অণিমাকে জানে—সেই লীলা-চঞ্চলা কিশোরীর ছবি তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

অণিমা তাহার চিবুকটি ধরিয়া তুলিয়া বলিল, কি গো ! বাপের বাড়ী যেতে চাইনি ব'লে রাগ হয়ে গেল বুঝি ? দেখছো কি, যে রকম ছিনে জোঁকের মত তোমায় কামড়ে ধরেছি, যম না এলে কেউ আমায় ছাড়াতে পারবে না।—চল, চল, শোবে চল। সত্যি, দিন-দিন আমি কত বড় নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি দেখছ। বাছাদের পানে সেই সন্ধ্যে থেকে একটিবারও নজর দিই নি। মেয়েটার ত হাড় পিষে দিয়েছি।

ক্ষিপ্রপদে বিছানায় উঠিয়া সে ঘুমন্ত ছবির গালে, মুখে, কপালে,

ছোট-ছোট হাত দুখানিতে অজস্র চুম্বন করে; তার পর তাহার গালের পাশে নিজের গালটি চাপিয়া অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে। চোখদুটি তার সজল হইয়া আসে।

সেদিন সুখেন কাছারী হইতে ফিরিয়া বলিল, ওগো, আজ সন্ধ্যের পর অমলরা গাড়ী পাঠিয়ে দেবে, তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে। তার ছেলের অন্নপ্রাশন।

একটু থামিয়া বলিল, শুন্‌লুম, ভারী ধূম-ধাম করছে। অমল বাড়ীর বড় ছেলে, তার আবার ঐ একটি ছেলে।

অণিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপা দিয়া বলিল, করবে না কেন, পয়সার ত অভাব নেই! আর তুমি? ছবির বেলা না-হয় কিছু করলেই না, আমার খোকামণির মুখেও সেই একটু পেসাদ দিয়েই সার্‌লে! আচ্ছা কৃপণ তুমি!

সুখেন মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল. তোমার খোকামণিটি বুঝি আমার ছবিরাণীর চেয়ে বড় হ'লো গো?

অণিমা মুখ ভার করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—যাও, যাও, তুমি ঐ ক'রে ভারী কথা ঘুরিয়ে দাও। এক-এক সময় সত্যি আমার ইচ্ছে হয়, তোমার সঙ্গে একদিন এমনি ঝগড়া করবো যে—

সুখেন বলিল, কি রকমটা শুনি? রীতিমত হাঁকডাক ক'রে? যাতে এই বাড়ী-ঘর-দোর—আশপাশের বাড়ীগুলো পর্যন্ত ভূমিকম্পের মত চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে? তা মন্দ হয় না! আমারও এক একবার দেখতে ইচ্ছে হয় তোমার সেই মূর্তি।

—কেন বল ত?

—তবু যেন তার সঙ্গে ছেলেবেলার সেই দুষ্টু অণিমাটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে! কিন্তু এ যেন তুমি হয়ে পড়েছ, একেবারে নিঝুম—নিতান্ত ভালমানুষ—

—থামো, থামো, আর তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে না। ঐ ত পুরুষমানুষের শয়তানী বুদ্ধি! যা হোক্ একটা বাজে কথাকে ফেনিয়ে তুলে আসল কথাটাকে চাপা দেওয়া।

প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া স্থখেন বলিল, আচ্ছা, আসল কথাই ধরা যাক্। অমল গাড়ী পাঠিয়ে দেবে। তুমি যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নাও।—সত্যি, যাও অণু! কি চমৎকার জায়গাটিতে যে ওরা থাকে! একেবারে নদীর ওপর ফুল-বাগান, তার পরেই বাড়ী। বাগানখানি যেন সত্যিই একটি ছবির মত, কত রকমারি ফুল আর ফলের গাছ যে জড় করেছে! দেখে এসো, তোমার খুব ভাল লাগবে!

অণিমা মুগ্ধচোখে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার বুকের নীচে কোন্ এক অশান্ত কিশোরী মেয়ে দাপাদাপি স্থরু করিয়া দিয়াছিল। গভীর তৃপ্তিমাখা একটুখানি সলজ্জ হাসির সহিত সে স্বামীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—তুমিও ত যাবে? তা হ'লে ছবিকে কিন্তু তুমি দেখো। নইলে দুজনকে আমি সাম্‌লাতে পারবো না।

—আচ্ছা।

অণিমা হাল্কা গতিতে শোবার ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, কোন্ কাপড়খানা পরি বল দিকিন্? আর কোন্ জামাটা? কাপড় যদি বা একখানা আছে, জামা কিন্তু ভালো একটাও নেই। তারপর—ও মা—

গালের উপর একখানি হাত রাখিয়া অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, বেশ ত যাবো-যাবো ব'লে নেচে উঠছি! এ দিকে যে—

—কেন, কি হ'ল?

অণিমা বিস্ফারিত দৃষ্টির সঙ্গে একটু করুণ হাসি মিশাইয়া বলিল,

আহা, কিছুই যেন জানো না! বলিয়া সে তাহার ডান হাতখানি দিয়া বাঁ-হাতের মণিবন্ধের তু-গাছি সরু সোণার রুলী এবং শূন্য বাহুমূল দেখাইয়া দিয়া আবার একটু হাসিল।

সুখেন বলিল, ঐ ত তোমাদের দোষ! এক-গা গহনা না হ'লে বুঝি কোথাও যাওয়া চলে না?

অণিমার মুখের হাসি নিবিয়া গিয়া একটা কঠিন দৃঢ়তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল, কোনমতেই চলে না। কত দেশ-বিদেশের মেয়েরা আস্‌বে, আর আমি যাব সেখানে এই রকম হা-ঘরের মত? —সবই ত আমার ছিল, আজ এই তু-বছর হ'তে চললো তুমি ত ছাড়িয়ে এনে দিচ্ছ!—ছাই যাবে! কোথাও আমি যাব না। এইখানে —এই বাড়ীর দেয়ালেই মাথা ঠুকে ঠুকে—

আরও কি বলিতে গিয়া সে হঠাৎ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। সুখেন মাথাটি নীচু করিয়া স্তব্ধের মত বসিয়া। ধীরে ধীরে সে মাথা তুলিয়া বুক পর্যন্ত ঠেলিয়া ওঠা একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা, আমি আর কি কর্‌ব বল! আমি ত আর নিজের জন্যে ও-গুলো—

অণিমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, আমার জন্যেও ত নয়!

সুখেন হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—না গো না, কারু জন্যে নয়। সবই আমার জন্যে—হ্যাঁ আমারই জন্যে ত! বলিতে বলিতে সে উঠিয়া একেবারে বৈঠকখানাঘরে আসিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে কাহার গলা শোনা গেল। দাদা রয়েছেন না কি?

সুখেন বাহিরে আসিয়া দেখিল, অমলের ছোট ভাই কনক। রাস্তায় একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া। তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল।

কনক বলিল, গাড়ী এনেছি। বৌদি তৈরী হয়েছেন তো?

সুখেন মুখখানা কাঁচু-মাচু করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—ও কি যেতে পারবে? শরীরটা ক'দিন থেকেই—বলিতে বলিতে সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

কনক হাঁকিয়া বলিল,—বাঃ, তা বল্‌লে কি চলে? দাদা বৌদি দুজনেই বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন।

একটু পরেই সুখেন বাহিরে আসিয়া বলিল, না ভাই, ওর যাওয়া হবে না। আজ সমস্ত দিন ও কিছু খায়নি। হঠাৎ অত্যন্ত পেটের যন্ত্রণায় কাল রাত্তির থেকেই কষ্ট পাচ্ছিল, এ-বেলা একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছে!

কনক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—তবে আর কি হবে!—আপনি আসছেন ত? আপনি যেন আর বেশী দেরী করবেন না। আমি যাই, এখনও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। বলিয়া সে আর দ্বিতীয় কথার অবকাশ না দিয়া গাড়ীতে উঠিল।

বাড়ীর ভিতরে আসিয়া সুখেন স্তব্ধের মত বসিল।

অণিমা কাছে আসিয়া বসিয়া তাহার হাত দুটি টানিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তুমি যাবে না?

—না।

—বা রে, না বললেই বুঝি চলে? তুমিও না গেলে কি মনে করবে ওরা বল ত? বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বরে অনেকখানি মিষ্টতা ঢালিয়া বলিল, তুমি আমার ওপর রাগ কর্‌ছো? কিন্তু এটুকু কেন তুমি বুঝেও বুঝতে চাইছো না যে, তোমার বউ হয়ে তোমারই বন্ধুর বাড়ীতে কেমন ক'রে এ বেশে গিয়ে আমি দাঁড়াব?

সুখেন বলিল, তাদের জান্‌তে বাকী নেই যে, আমরা বড়লোক নই তাদের মত!

—জানুক্। যা-খুসী জানুক তারা! তবু সেই দৈন্যকে গায়ে জড়িয়ে আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নে। তোমার সম্মান হয় ত তোমার কাছে কিছু না-ও হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার দাম যে ঢের বেশী। এ কথাটা আমি কোনও দিনই ভুলতে পারবো না যে, আসলে তুমি তাদের চেয়ে ছোট নও কোন দিক দিয়ে!—কথা শোনো, তুমি যাও ছবিকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি!

ছবিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া, ভাল জামা পরাইয়া দিয়া চিবুকটি ধরিয়া চুমা খাইয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়া দিতে দিতে অণু বলিল,—বেশী রাত ক'রো না যেন, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ফিরো।

তারপর সে দরজা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া শোবার ঘরে খোকাকে লইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

আজ তাহার ছুটী। হ্যাঁ, ছুটী! কিন্তু, এ ছুটীতে আনন্দের একটি স্ফুলিঙ্গও নাই। আছে শুধু অবসাদের নির্জীবতা, আছে শুধু একটা নির্বিকার নৈরাশ্য!

খোলা জানালা দিয়া সরু চাঁদখানি হইতে নিষ্প্রাণ একটু জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে বিছানার উপর। ঘোলাটে নীল আকাশেও যেন আজ একটা অবসন্নতা, বাতাসেরও যেন এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপিয়া-টিপিয়া যেন সে এক-একবার ঘরে ঢুকিতেছে, আবার তেমনি সন্তর্পণে সরিয়া যাইতেছে, পাছে তাহার এতটুকু চাঞ্চল্যে জগৎজোড়া এই মৌন অবসাদের ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়।

ধীরে ধীরে অণিমার চোখের পাতাদুটি ভারী হইয়া আসে। নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিপথে তাহার মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে—নদীতীরে চমৎকার একখানি সাজানো বাগান। ছোট-বড় গাছগুলির ঘন সবুজের বুকে অজস্র ফুলের হাসি নীল আকাশের বুকে অসংখ্য তারার সহিত মুখোমুখি চাহিয়া আছে, বলিতেছে যেন—আমরাও ছোট

নই—তুচ্ছ নই তোমাদের কাছে। দু-কূলভরা নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূর হইতে দূরান্তরে—ঘন-কালো তরুশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে একেবারে আকাশের নীলিমার সহিত গিয়া মিশিয়াছে। আকাশ যেন আদরে গলিয়া গিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। বাগানের পাশের স্বপ্ন-পুরীর মত বাড়ীখানির ভিতর হইতে অবিরাম আনন্দ-কলরোল আসিয়া নদীর রূপালি জলে, পুষ্পিত বাগিচার দিকে-দিকে, হাস্যময় শূন্য আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুটোপুটি খাইতেছে।

হঠাৎ কি একটা ঝট্ পট্ শব্দে অণিমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ চাহিল। জানালার বাহিরে পড়া-মাঠের ঐ গাছটার ভিতর কোথাকার একটা পাখী যেন ডানা ঝট্‌পট্ করিতেছে। তাড়াতাড়ি অণিমা জানালার ধারে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাঁকড়া গাছের ঘনান্ধকার পত্রাবলীর ভিতর হইতে কিছুই তাহার চোখে পড়িল না।

অরূপ রতন

এম্‌নি দারুণ অনৈক্যভরা এই জীবন !

ভিতরের মানুষটা যতই সকল বাধাবন্ধ টানিয়া ছিঁড়িয়া মুক্ত পাখীর মত পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়, বাহির হইতে ততই নিত্য-নূতন বাঁধনের বোঝা তাহার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

জয়ন্তর মতে জীবনের এতবড় করুণ সমস্যা আর দুটি নাই। জীবনটাকে সে নিজে যেদিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে চায়, সেদিকে সংসারের কাহারো কোন সহানুভূতি নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে লুকাইয়া কবিতা লিখিত, এবং তাহার জন্য বাবা—দাদা—স্কুলের মাষ্টার, সকলের কাছেই ভর্ৎসনার আর বাকী ছিল না। তাঁহাদের ভর্ৎসনা আর শাসনের গুণেই হোক্, বা নিজের কৃতিত্বের জোরেই হোক্, পরের পর সে এতগুলো পাশ করিয়াছে। এখন চায়, একটু নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ঢালিয়া দিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত তাহার লাইব্রেরী ঘরের ইজি-চেয়ার খানিতে পড়িয়া পড়িয়া বিশ্বের অনন্ত ভাবুকতার স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে। কিন্তু কিছুতেই তাহা হইবার উপায় নাই। এই তো দিন পনেরো ধরিয়া দাদার অসুস্থতার দরুণ তাঁহার আদেশমত তাহাকে বড়বাজারের গদীতে বসিতে হইতেছিল, আজ আবার দাদার নূতন ফরমাস্ হইয়াছে। দুই-এক দিনের ভিতরই পাবনা যাইতে হইবে। সেখানকার জমিদারীতে কি সব নাকি গোলযোগ সুরু হইয়াছে।

অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। কেন না, দাদার শরীর এখনো দুর্বল। তাঁহার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ, না গেলেই নাকি নয়। একে ত দাদা মনে করেন, ভাইটি একেবারেই অকর্মণ্য। সে ধারণাটুকু আরও বেশী বদ্ধমূল করিয়া লাভ কি?

পাবনায় তাহাদের একখানি বাড়ী সম্প্রতি নাকি খালি হইয়াছে। দাদা বলিয়াছেন, একজন লোক সঙ্গে লইয়া জয়ন্ত সেখানে গিয়াই এখন থাকিবে। সেখানকার কাজ মিটিয়া গেলে আবার ভাড়া বিলি করিলেই চলিবে।

ব্যবস্থাটা একদিক্ দিয়া জয়ন্তর মন্দ লাগিল না। এখানে তো নিশ্চিন্তভাবে একটু পড়াশুনা করিবারও উপায় নাই। সেখানে তবু কাজের অবসরে নিরিবিলি একটুখানি জ্ঞান-সাধনা করিলেও বাধা দিবার কেহ থাকিবে না। সুতরাং দাদার কথায় জয়ন্ত সম্মতি দিল অনেকটা সানন্দেই।

পাবনায় যে লোকটি তাহাদের বাড়ী-ঘরের তদ্বিরাদি করে, সে কোন খবরই জানিত না। হঠাৎ ছোটবাবুকে একজন অনুচর এবং বিছানা-পত্র সুটকেশ প্রভৃতি লইয়া এখানে আসিয়া হাজির হইতে দোখয়া সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

জয়ন্ত বলিল,—খবর সব ভালো তো, সনাতনবাবু?······থাক্, থাক্, আপনাকে একেবারেই ব্যস্ত হতে হবে না। রাঁধবার লোক আমি সঙ্গে করে এনেছি। ঐ খালি বাড়ীখানার চাবিটা পেলেই আমার হবে। এখন কিছুদিন থাক্‌তে হবে কিনা, তাই এই ব্যবস্থা।

ছোট একতলা বাড়ী, অনেকটা বাংলো ধরণের তৈরী। সামনে অনেকখানি খোলা মাঠ। জয়ন্ত বেশ খুসীই হইল। নির্জন-বাসটা মন্দ কাটিবে না। অন্ততঃ কলিকাতার সেই তাড়াহুড়া আর ধূলাবালির তুলনায় এ তো একেবারে—

চমৎকার! তার মনে হইল, নিছক্ বেড়াইতে আসা ছাড়া এখানে তাহার কোন-রকম কর্তব্যের পিছটান নাই। জমিদারীর যে-সব গোলযোগের কথা দাদা বলিয়াছেন, সে আর এমন কি ব্যাপার! এখান হইতে গোমস্তাদের তলব দিলেই সব ব্যবস্থা করা চলিবে। তাতে কতটুকু সময়েরই বা প্রয়োজন!

ভাঁজকরা ক্যাম্পখাটের পরিষ্কার নরম বিছানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া জয়ন্ত একখানা ইংরেজী প্রেমের উপন্যাসে মস্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ এক সময় নিজের মনেই অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বইখানা উপুড় করিয়া বলিল,—এত বড় রোমান্স কই জীবনে তো দেখা যায় না! আগাগোড়াই গাঁজাখুরী গল্প!

অলসভাবে সে খানিকক্ষণ চুপচাপ কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। কড়ির স্থানে স্থানে অনেক ঝুল জমিয়াছে। এক জায়গায় বেশ খানিকটা কালো রং ধরিয়াছে। যাহারা ভাড়া ছিল, এই ঘরেই রান্না করিত না কি? কে জানে!

দেয়ালের গায়ে কি সব হিজিবিজি লেখা। আশ্চর্য অকর্মণ্য এই সনাতনটা! ভাড়াটে উঠিয়া যাইবার পর হোয়াইট-ওয়াশ করাইবারও ফুরসৎ হয় নাই! দাদার বাহিরে যেমন কড়াকড়ি, ভিতরে তেমনি আল্‌গা! ঐ অকর্মণ্য লোকটাকে মাসের পর মাস মাহিনা গণিতে হইতেছে, অথচ এইসব সামান্য বিষয়ে নজর দিবারও অবকাশ থাকে না!

সন্ধ্যার সময়েই সনাতন দেখা করিতে আসিলে সে বেশ জমিদারী গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া বলিল,—আপনার দেখ্‌ছি অবসর নিতান্ত কম। না?

সনাতন একটু কাঁচু-মাচু করিয়া বলিল,—আজ্ঞে—তা—

জয়ন্ত বাধা দিয়া বলিল,—কিন্তু এগুলোর দিকে তো একটু-আধটু নজর দেওয়া কর্তব্য! দেখুন দেখি, দেয়ালময় হিজিবিজি কাটা।

শোবার ঘরের ভিতর হয়তো রাঁধাবাড়াও চল্‌তো, শিলিঙে রীতিমতো ধোঁয়ার দাগ ধরেছে। এক মাস হলো ভাড়াটে উঠে গেছে বল্‌ছেন, হোয়াইট-ওয়াশের আর কত খরচই বা লাগ্‌তো! আর তাও যদি না ছিল, সেখানে লিখ্‌লেও তো—

সনাতন রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—আজ্ঞে খরচের জন্যে লিখ্‌তে হবে কেন? তবে ও-ভাড়াটেরা তো বেশীদিন থাকে নি। ছ'মাস মাত্র এসেছিলেন—তার আগে ভাল করে চূণকাম হয়েছিল কিনা!

—বলেন কি! ছ'মাসের মধ্যেই বাড়ী এমনি যাচ্ছেতাই রকম নোংরা করে গেছে! Dirty fellows! এক লরীভর্তি ছেলেপিলে বুঝি?

—আজ্ঞে না। সবডেপুটিবাবু আর তাঁর স্ত্রী আর একটিমাত্র মেয়ে। আর তো কেউ ছিল না!

—বটে? তা, ডেপুটিগিরি চাকরি, হঠাৎ এত শীগ্‌গির বদ্‌লী হ'য়ে গেলেন যে? ছোকরা বোধ হয় এখনো পাকা হয়নি?

—আজ্ঞে না, বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। মেয়েটি এবার ম্যাট্রিক দেবে।

—তা হলে তো বেশ ষ্টাইলিস পরিবার হওয়া উচিত।...... থাক্‌গে ও-সব কথা! তা হ'লে হোয়াইট-ওয়াশের ব্যবস্থা করে দিন, বুঝলেন? আর দু-একটা ফার্ণিচার এখানে ভাড়া পাওয়া যাবে না? অন্ততঃ একটা বুক-সেল্‌ফ আমার জরুরী রকমের দরকার হ'য়ে পড়েছে। একরাশ বই ঐ স্যুটকেশটাতেই গাদাবন্দী হয়ে পড়ে আছে। সে-গুলো ঝেড়ে-ঝুড়ে সাজিয়ে রাখ্‌তে হবে।

—দেখি, যদি কোথাও পাই—

—হ্যাঁ, দেখ্‌বেন। হোয়াইট-ওয়াশটা কিন্তু না হলে আমি একেবারেই টিক্‌তে পার্‌বো না! কালই হবে তো?

—আজ্ঞে, কাল বলে রাখ্‌বো। পরশু সকালেই কাজে লাগ্‌বে তারা।

—বেশ, তাই হবে। কাল কিন্তু যেন খবর দিতে ভুলবেন না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল,তখন পূবের রুদ্ধ জানালাটার ফাঁক দিয়া দুটো গোলাকার সূর্যরশ্মি আসিয়া মশারির উপর পড়িয়াছে। চোখ মেলিয়া সেদিকে চাহিয়াই মনে হয়, অন্ধকারের ভিতর হইতে কাহার যেন দুটী কৌতূহলী চোখ তাহারই পানে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। কল্পনাটা জয়ন্তর কাছে ভারী মিষ্ট লাগিল। মানুষের মনের পিপাসাটা এমনিই তো বটে। এম্‌নি সজাগ দুটি চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিই বুঝি এ জীবনে সব চেয়ে বড় কাম্য!

মশারির ভিতরে পড়িয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ সেই রৌদ্র-গোলক দুটির পানে চাহিয়া থাকিয়া জয়ন্ত শেষে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূবের সেই জানালাটা খুলিয়া দিতেই অনেকখানি সূর্যকিরণ তাহার বিছানায় আসিয়া পড়িল। রাত্রিতে বেশ জোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে, ঠাণ্ডাও একটু পড়িয়াছে। রোদের পানে চাহিয়াই যেন মনে হয় শরৎ আসিয়া পড়িল। এমন উজ্জ্বল প্রভাত কলিকাতায় চোখে পড়ে না বলিলেও হয়। জয়ন্ত মনে মনে বলিল,—কবিরা যে প্রভাতের বন্দনা গাহিয়াছেন, তাহা আজিকার এই প্রভাত!

পাশের দেয়ালের উপর এক ঝলক রোদ লাগিয়াছে। জয়ন্তর নজরে পড়িল, সেই সূর্যালোকে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে দেয়ালের গায়ের পেন্সিলের লেখাটুকু—

"ভোরের বাতাস ওরে কোথা যাস্
যাস্ বঁধুয়ার দেশে!"

ভারী চমৎকার তো! কে যেন আজিকার এই গরিমাময় প্রভাত-টুকুর বন্দনা গাহিয়াই লিখিয়া রাখিয়াছে গানের ঐ চরণদুটী!

বহুদিন পূর্বে কোথায় যে এই গানটা সে শুনিয়াছিল, তাহা আজ ঠিক মনে পড়ে না। তবে চমৎকার লাগিয়াছিল গানখানি। একবার তাহার মনে হইল, পেন্সিল লইয়া ঐ কথাগুলির নিচে সেও লিখিয়া দেয়—

"উড়িয়ে আনিস্ কস্তুরীবাস
মাখানো বঁধুর কেশে!"

চাকর চা দিয়া গেল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জয়ন্ত ভাবিল, সব-ডেপুটিবাবুর রসানুভূতি ছিল। গানখানি হয়তো কোনদিন খুবই ভালো লাগিয়াছিল, তাই—

তখনই আবার মনে হইল, না না, খুব সম্ভব তিনি নন, এ লেখা তাঁর মেয়ের। সেই যে মেয়েটি ম্যাট্রিক পড়িতেছে, এ নিশ্চয় তারই লেখা।

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া উঠিয়া সে দেয়ালের লেখাগুলি পর্যবেক্ষণ স্নুরু করিল। এক জায়গায় দোখল, জিওমেট্রির একটা থিওরেম আগাগোড়া দেয়ালের গায়ে লেখা। জয়ন্তর ভারী মজা লাগিল। নিশ্চয় সেই মেয়েটিরই কাজ! হয়তো কিছুতেই মুখস্থ রাখিতে পারিত না, তাই বারবার বই খোলার কষ্টটুকু এড়াইবার জন্য মগজের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের এমনই একটা সহজ সংযোগ করিয়া রাখয়াছিল। মুখস্থ করিতে না পারুক, একদিক্ দিয়া বুদ্ধিমতী বলিতে হইবে।

আর, নিশ্চয় খুবই আদুরে মেয়ে। না হইবেই বা কেন? বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। সংসারে একটিমাত্র মেয়ে হইলেই তো তার সাতখুন মাপ! তাহার উপর পয়সারও অভাব নাই নিশ্চয়! গরীব হইলে তবু গৃহস্থালী শিখিবার জন্য মায়ের কাছে একটু আধটু তাড়না

সহিতে হইত। এ-ক্ষেত্রে সে সব বালাই নাই। মা বেচারা হয়তো সেকেলে এবং হয়তো অশিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতা, আর মেয়ে রীতিমত ম্যাট্রিক পড়িতেছে, এক কথায় যাকে 'ধিঙ্গি মেয়ে' বলিতে পারা যায়। তার উপর আছে বাপের অফুরন্ত আদর। মেয়ের উপর বাপের আদরের আতিশয্য, এত একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার! বাবা কাছারী হইতে আসিবার আগেই মেয়ে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিত এবং হয়তো বাবা না-আসা পর্যন্ত চুপটী করিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত, বাবার সঙ্গে না খাইলে তাহার খাওয়াই হয়তো হইত না।

পেয়ালার তলাকার চা-টুকু জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। চুমুক দিয়া নামাইয়া রাখিয়া জয়ন্ত হাঁকিয়া বলিল,—ওরে গোবিন্দ! চা-টা আজ একেবারেই কিচ্ছু হয়নি। আর একবার ভালো করে কর্ দেখি!

তারপর চায়ের প্রত্যাশায় ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ারে অলসভাবে গা ঢালিয়া দিয়া জয়ন্তর মনে হইল—আচ্ছা, এই অদ্ভুত রকমের আদুরে মেয়েটির নামও ত এই দেয়ালেই লেখা থাকা উচিত!

উঠিয়া আবার সে এ-দেয়াল ও-দেয়াল খুঁজিতে সুরু করে। অনেক রকমের লেখা তাহার চোখে পড়ে। ইংরাজী এবং বাঙ্গলা নানারকমের কথা, কত কবিতা ও গানের ভাঙ্গা চরণ, কত প্রবাদ, পাঠ্যপুস্তকের কত কঠিন পাঠ, কত এলোমেলো ছবি ঐ দেয়ালের গায়ে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহার নাম পাওয়া গেলনা তো? আশ্চর্য বটে! মানুষের নাম জাহির করিবার আকাঙ্ক্ষাটাই বরং অপর সব আকাঙ্ক্ষাকেই ছাপাইয়া ওঠে। অথচ এ মেয়েটি সেদিকে একেবারে চুপচাপ। যে পরিমাণ প্রাচীরলিপি সে রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ দশটা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ছাঁদে নিজের নামটা লিখিয়া রাখা উচিত ছিল। সেদিক্ দিয়া মেয়েটিকে নিরভিমান বলিতে হইবে। এ-যেন ঠিক সেই নীরব

কবিদের মতই। সারা জীবন নিজের অন্তরের অনুভূতির প্রেরণায় কাব্যচর্চা করিয়া গেল; কে সে কাব্যের রসাস্বাদ করিল, তাহারও জন্য কোন উদ্বেগ নাই। যদি বা কখনো সেই কাব্য লোকের ভাল লাগিল, কাব্যই অমর হইয়া রহিল, মানুষটা কে, ধরা পড়িল না।

গোবিন্দ আবার চা দিয়া গেল। তাজা গরম চায়ের পেয়ালায় ছোট-ছোট চুমুক দিতে দিতে জয়ন্ত নিজের কল্পনার পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া চলিল। এক সময় মনে হইল, হয়তো সুন্দরীই হইবে মেয়েটি। একেবারে পরী না হোক, দেখিতে নিশ্চয়ই বেশ সুশ্রী। রং হয়তো একটু কালো হইতেও পারে, কিন্তু দেহের এবং মুখের একটা সুসমঞ্জস গঠন, এটুকু যে আছে, তাহা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়।

হঠাৎ তার নিজের মনেই হাসি আসে। তখন নিজেই নিজের প্রতিবাদ করিয়া বলে,—তাই বা কেমন করিয়া বলিতে পারা যায় যে, সে অতি কুশ্রী নয়? এমন তো বহু মেয়েই দেখা যায় যে, পড়াশুনা গান বাজনায় ওস্তাদ, অথচ রূপের ঘরে শূন্য। এ-ও হয়তো তাই।

যে সুটকেশটার ভিতর বই খাতা ফাউণ্টেন-পেন প্রভৃতি ছিল, সেটা খুলিয়া জয়ন্ত এক-একখানা বই টানিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছিল। লেটার-প্যাড্‌খানা বাহির করাই ছিল, দাদাকে আজই একখানা চিঠি লেখা দরকার, অথচ কিই বা লিখবার আছে! সেই মামুলী প্রথামত নিছক পৌঁছানো সংবাদ আর কুশল প্রশ্ন, এ-ছাড়া তো কিছু নয়!

একখানি বইয়ের ভিতর হইতে পুরাণো একখানি খাম বাহির হইয়া পড়িল। খামের ভিতর একখানি চিঠি, জয়ন্তর বৌদি তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে জয়ন্তকে লিখিয়াছিলেন। সেবার কোথায় নাকি একটী সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছিলেন, তারই শুভ-বার্তা এই চিঠিখানিতে।

জয়ন্তর মনে পড়িল, কেমন কৌশল করিয়া সে সেবার বিবাহের উদ্যোগ-পর্বটা পণ্ড করিয়া দিয়াছিল। সেই হইতে বৌদি আর

তাহার বিবাহের নাম মুখে আনেন না। জয়ন্তও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

আশ্চর্য! সেই নিতান্ত মামুলী প্রথায় একটি মেয়েকে পছন্দ করিয়া একদিন শাঁখ বাজাইয়া ঘোমটা পরাইয়া ঘরে আনিয়া তোলা—কোনো দিক্ দিয়া কোন রকমের বৈচিত্র্য বা নূতনত্বের নামগন্ধও নাই। প্রকৃত মিলন বলিতে যদি মনের মিলনই বুঝায়, তাহা হইলে যেখানে পাওয়ার আগে মন অদম্য একাগ্রতায় উন্মুখ হইয়াই না উঠিল, সেখানে পাওয়ার সার্থকতা রহিল কৈ? বরং যাহাকে জানি না, চিনি না, অথচ যার রূপ বা গুণ সহসা একদিন দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত ঘুমন্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে ঘা দিয়া যায়, তাহার মূল্য আছে ঢের বেশী। সারা জীবন ধরিয়া সেই চকিত স্পর্শের ঝঙ্কারটুকুতেই তন্ময় হইয়া কাটাইয়া দিতে পারা যায়! প্রকৃত মনের মিলন তো সেইখানেই!

একখানি বিদেশী উপন্যাস টানিয়া লইয়া সে ক্যাম্পখাটের উপর শুইয়া পড়িল। কিন্তু বই খুলিতে গিয়া নজরে পড়িল, দেয়ালের একটা জায়গায়। বাড়ীতে কোন্ সময় কি-কি পড়িতে হইবে, তাহার একটা রুটিন দেয়ালের উপর আঁটা। জয়ন্ত উঠিয়া বসিয়া ভাল করিয়া রুটিন্‌টা দেখিল। আজ মঙ্গলবার; এবং এখন—রিষ্টওয়াচ্‌টা দেখিল—রাত্রি এই আটটা। এখন ছিল তাহার ইংরেজী কবিতা পড়িবার সময়। তা, সত্যই কবিতা পড়িবার সময়ই বটে! ঠিক ঐখানে—ঐ জানালার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া দুলিতে দুলিতে সে হয়তো তন্ময় হইয়া কবিতা মুখস্থ করিত। ঐ পূবের আকাশ হইতে হয়তো এক-ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িত তাহার মাথার এলো-খোঁপার উপর, অথবা ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিত তাহার স্খলিত আঁচলখানিতে।

নিজের পড়া বন্ধ হইয়া গেল। মনে হইল, মিথ্যা এই অপরের রচিত উপন্যাসের কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া চলা। মনে যখন জোয়ার

আসে, তখন নিজেই যে সৃষ্টির আনন্দে তন্ময়, অপরের সৃষ্টির দিকে চাহিবার অবকাশ কোথায় ?

চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া-পড়িয়া সে তার অপরূপ সৃষ্টিটুকুকে নিখুঁত করিয়া তুলিতে চাহিল। হঠাৎ এক সময় মনে হইল, কল্পনার মূর্তিখানিতে সে সত্যই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। মুদিত চোখের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া উঠিয়াছে তাহার লাবণ্য। সে যেন এই বাড়ীতেই তাহারই আশে-পাশে তাহার সলীল ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি, কাণে যেন ভাসিয়া আসিতেছে তাহার গান—'ভোরের বাতাস ওরে কোথা যাস্…'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই গোবিন্দ জানাইল, দুইজন লোক অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে।

জয়ন্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, লোক দুইটার সঙ্গে একটা চূণলাগা বাল্‌তি, খানিকটা নারিকেলের দড়ি এবং একটা পোঁচড়া।

তাহাকে দেখিয়াই মিস্ত্রী সেলাম করিয়া জানাইল,—সনাতনবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর এই চূণ আর 'বুলু' দিয়েছেন।

জয়ন্ত প্রথমে ব্যাপার ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। বলিল,—ও, চূণকাম কর্‌তে এসেছো তোমরা ? তা, তা—হ্যাঁ, চূণকাম করার কথা বলেছিলুম বটে সনাতনবাবুকে—

মিস্ত্রী বলিল,—আজ্ঞে, তিনি কালই বলেছিলেন আমাকে। তা, কাল আর—

জয়ন্ত একটু নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই যেন হাঁকিয়া উঠিল,—ওরে ও গোবিন্দ ! কত দেরী কর্‌বি আর চায়ের ?

মিস্ত্রী বলিল,— বাঁশ তো দুটো লাগ্‌বে, হুজুর !

জয়ন্ত বলিল, এঁ্যা! ও, বাঁশ! হ্যাঁ, আচ্ছা—না, না, থাক্‌গে। বুঝেছ? ও সব আর এখন কাজ নেই মিস্ত্রী!

মিস্ত্রীর বুঝিবার কথা নয়। তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। জয়ন্ত বলিল,—বুঝ্‌তে পার্‌লে না? সনাতনবাবুকে বলোগে, চূণকামের দরকার হবে না। এই তো ছ'মাস আগে হয়েছে কি না! এরই মধ্যে আবার কেন?

মিস্ত্রীদের বিদায় করিয়া জয়ন্তর মনটা হঠাৎ যেন অতিরিক্ত খুসীতে ভরিয়া উঠিল। যেন সে অতি বড় অন্যায়ের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে। চা খাইতে-খাইতে সামনের দেয়ালের লেখাটার পানে চাহিয়া-চাহিয়া আপনার মনেই হাসিয়া সে বলিল,—কার্জন সাহেব অমর হয়েছিলেন এন্‌সিয়েণ্ট মনুমেণ্টগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। সে অমরত্বের খানিকটা হয়তো আমারও প্রাপ্য হবে। এত বড় একটা আর্ট—

আর্ট বৈকি! যে অপূর্ব রসানুভূতি আত্মগোপন করিয়া আছে এই লেখাগুলির পিছনে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে আর যে পারে পারুক্, জয়ন্ত পারিবে না। চূণের পোঁচড়া লাগাইয়া এত বড় আর্টের শ্বাসরোধ করিতে সে পারিবে না।

এম্‌নি করিয়াই দিন কাটে। কি-যে কাজে জয়ন্ত পাবনায় আসিয়াছিল, সেটা যেন তাহার মন হইতে একেবারেই মুছিয়া গেছে। চুপচাপ একা বসিয়া বসিয়া মনের অফুরন্ত ভাবুকতায় কোন্ অনাবিষ্কৃত স্বপ্নরাজ্যে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী শুধু একটি প্রাণী—একটি মেয়ে, প্রজাপতির মত হাল্কা যাহার গতি, ফুলের গন্ধে সুরভিত যার নিশ্বাস, অনন্তের রং-ধরানো যাহার মনে। মনে হয়, দেয়ালের ঐ লেখাগুলি যেন এক একটি অতি সূক্ষ্ম পথ, যে পথ ধরিয়া পৌঁছানো যায় সেই রহস্যময়ী অপরিচিতার অন্তররাজ্যে।

এম্‌নি কল্পনা-বিলাসের মাঝে আনন্দ যতই থাক্‌, অবসাদও আছে অনেকটুকু। জয়ন্তর মন এক একসময় অবসন্নতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেয়ালের প্রতিটি লেখা তাহার মুখস্থ হইয়া গেছে, প্রতিটি ছবি বুঝি তাহার মনের পটেও আঁকা হইয়া গেছে। তবু মনে হয়, এত বড় মিথ্যা সংসারে আর কিছুই নাই। কোথাকার কে, জানা নাই, শোনা নাই, কল্পনায় তাহারই চারিপাশে একটা গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, ইহাতে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এ বৈচিত্র্যের অর্থ কি? প্রতিমা নাই, অথচ একটি ঘটকে সাম্‌নে রাখিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া দেওয়ায় পূজা হয়তো সার্থক হইতে পারে, কিন্তু পূজারীর মন ভরে কেমন করিয়া?

হঠাৎ একদিন জয়ন্ত দাদাকে জানাইল, এখানে তাহার ভাল লাগিতেছে না, শীঘ্রই ফিরিবে।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া জয়ন্ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে তবু মনে হয়, পাবনার সে বাড়ীখানাতে আবার হয়তো নূতন ভাড়াটে আসিয়াছে এবং নিশ্চয়ই তাহারা তাগাদা দিয়া চূণকাম করাইয়া লইয়াছে। দেয়ালের লেখা এম্‌নি করিয়াই মুছিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এক অপরূপ রহস্যে জড়াইয়া তাহার মনের পটে আঁকা হইয়া রহিল, কবে যে তাহা নিশ্চিহ্ন হইবে, কে জানে!

এক একসময়ে মনে হইত, লেখা মুছিয়া গেলেও হয়তো একদিন এমন হইতে পারে যে, শরীরিণী সেই মেয়েটীরই সহিত তাহার দেখা হইয়া যাইবে। বিরাট এবং বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্র তাহার গতি, কে বলিতে পারে কেমন করিয়া কোথায় দেখা হইবে! সত্যই যদি দেখা হয়, তাহা হইলে কল্পনার মূর্তিটির সহিত আসল মানুষটির মিল হইবে কি? কে জানে!

মাস দুই পরে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহাতে জয়ন্তর মনের ক্ষীণতম আশাটুকু হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটি। দল বাঁধিয়া দেওঘর বেড়াইতে আসিয়াছিল। সেদিন নন্দন পাহাড়ের উপরকার মন্দিরের পিছন দিক্‌টায় হঠাৎ জয়ন্তর দৃষ্টি আট্‌কাইয়া পড়িল। ঠিক্ সেই হাতের লেখা! এ লেখা জয়ন্ত কিছুতেই ভুলিতে পারে না যে! দুই লাইন কবিতা মন্দিরের সাদা দেয়ালের গায়ে লেখা ঃ—

"রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে,
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।"

এবং, শুধু ঐ সুপরিচিত হস্তাক্ষরের ঐ কবিতাটুকুই নহে, তাহার নীচে লেখা তাহার নাম—

মলয়া সেন
১৫ই আশ্বিন, ১৩৪০

নিশ্চয়ই সেই! এ লেখা চিনিতে জয়ন্তর একেবারেই ভুল হইতে পারে না!

খানিকদূরে একখানা বড় পাথরের উপর বসিয়া বন্ধুরা ফটো তুলিবার আয়োজন করিতেছিল। জয়ন্ত কাছে আসিয়া বলিল,—হ্যাঁ হে সুরেশ, আজ বাংলা তারিখটা কত বলতে পারো?

ক্যামেরার কাঁচের উপর চোখ রাখিয়া সুরেশ বলিল, বাঙালীর ছেলে, বাংলা ভুলে গেলে বাবা! ১৬ই আশ্বিন।

জয়ন্তর বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। মোটে একদিন আগেকার লেখা। তাহা হইলে সেও আসিয়াছে দেওঘরে! হয়তো তাহাদের শান্তি-নিবাসের কাছাকাছি বেলাবাগানেই কোথাও থাকে!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতেই একটা অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতায় মন তাহার ভরিয়া গেল। মন বলিল, জানিত সে দেখা একদিন হইবেই। মানুষের অন্তরে-অন্তরে যে এক একটা

সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে, তাহা এই সব ব্যাপার হইতেই বোঝা যায়। তাই হয়তো তাহাদের দু'জনের অজ্ঞাতেই একের মন অপরকে আকর্ষণ করিতেছে।

পরের দিনই সদলবলে দেওঘর ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা। সকাল হইতে বন্ধুরা গোছগাছ করিতেছিল। জয়ন্ত কিন্তু তখনো তাহার বিছানাটীতে নিস্পৃহ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুরেশ বলিল,—ব্যাপার কি হে? দেওঘর বাসের সাধটা এখনো তোমার কাটেনি বুঝি?

জয়ন্ত পাশমোড়া দিয়া বলিল,—সত্যিই। তোমাদের এত করে' বল্‌ছি, থেকে যাও আর কিছু দিন, তা তো শুন্‌বে না!

সুধীন বলিল,—তোমার গরজ থাকে, থাকো না, ভাই। আমি বরং গিয়ে বল্‌বো'খন তোমাদের বাড়ীতে—

জয়ন্ত হঠাৎ উৎসাহের সুরে বলিয়া উঠিল,—সত্যি, বল্‌বে দাদাকে? ভারী চমৎকার লাগ্‌ছে climateটা। এই তো মোটে পশ্চিমে বাতাস সুরু হয়েছে! আসাই যখন গেছে, তখন এরই মধ্যে ফিরে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

সুরেশ বলিল,—Be frank, জয়! তুমি যাবে, না, যাবে না?

জয়ন্ত বলিল,—বলেছি তো যেতে বেশ মন সর্‌ছে না!

—ব্যস্‌ ব্যস্‌। তা হলে তুমি রইলে। খুব ভালো কথা। তোমার তো ভাই পরিপূর্ণ অবসর—

বন্ধুরা চলিয়া গেল। জয়ন্ত রহিল। আবার সেই একা! সঙ্গে একটি চাকর, রাঁধা-বাড়া করিতে পারে। সুতরাং কোন কষ্ট নাই। জয়ন্ত যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল।

বৈকালে নন্দন-পাহাড়ে উঠিল, এবং যতক্ষণ সেখানে ছিল, জসিডির বনানীর ওপারে সূর্য অস্ত গিয়া অন্ধকার নামিয়া না আসা

পর্যন্ত সে মন্দিরের আশে-পাশেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যেন ওখানেই আছে তাহার জীবনের যা-কিছু সম্পদ, পার্থিব এবং অপার্থিব সব কিছুরই চরম পরিণতি ঐখানে!

কবিতার চরণদুটি কেবলই তাহার মনের মাঝে হিল্লোলিত হইয়া ফিরিতেছে।

"রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।"

এই অনুক্ত বাণীটি যেন তাহার নিজের হৃদয়ের মাঝেও স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। প্রভাতের প্রথম কুসুম হয়তো কোনদিন সত্যই রাত্রিশেষের শেষ-তারাটির সাক্ষাৎ পাইল না, শুধু তাহার ঘুমন্ত বুকে তারাটী তার নীরব বাণী মুদ্রিত করিয়া দিয়া গেল এবং কুসুমের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সেই বাণীর আনন্দ-শিহরণেই যেন সে বিকশিত হইয়া উঠিল। এম্‌নি কি-এক অপরূপ আনন্দ-শিহরণে জয়ন্তর নিজের অন্তরও বুঝি আজ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে!

আশ্চর্য! কবিতাটি তো সে আগেও পড়িয়াছে, কিন্তু অর্থটুকু তো কোনদিন এমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই!

জয়ন্ত আশা করিয়াছিল, নন্দন পাহাড়েই হয়তো একদিন দেখা মিলিবে। তাই প্রতিদিন সে নন্দন-পাহাড়েই যায়। কত মেয়ে আসেও, কিন্তু কেমন করিয়া বুঝিবে, উহারই ভিতর আছে কিনা মলয়া সেন। মন বলে,—নিশ্চয়ই নাই। তাহাকে দেখিলেই চিনিতে তাহার বাকী থাকিবে না যে! তাহার ভিতরে আছে এমন একটা অসাধারণত্ব, যা কোন মতেই জয়ন্তর চোখ এড়াইতে পারিবে না।

প্রতিদিনই সে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। কোথায়—কোন্ বাড়ীতে সে আসিয়াছে,—তাহার বাবা—সব ডেপুটিবাবুরই বা নাম কি, কিছুই তো জানা নাই! পোষ্টাপিসে খোঁজ করিলে হয়তো—না,

ছি! একজন ভদ্রমহিলার নাম ধাম লইয়া সহর তোলপাড় করিয়া বেড়ানো,—সত্যই সে তো পাগল হয় নাই। কত লোকে হয়তো কত কি মনে করিতে পারে!

সুতরাং সন্ধান মিলিল না। তবুও আশা হয়, মিলিবে একদিন দেখা, এইখানেই। কোন্ সুদূর হইতে অচেনা প্রিয়বস্তুটি যখন আজ এত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—একই সহরে দু'জনের বাস, হয়তো একই পাড়াতে, হয়তো একই রাস্তা দিয়া দু'জনে দু'জনকে কতবার পাশ কাটাইয়া গিয়াছে, অথচ চিনিতে পারে নাই,—তখন চোখাচোখি দেখা পাওয়াটা এমন কিছু হয়তো কঠিন হইবে না।

আশার আনন্দে জয়ন্তর অন্তর উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। মনে মনে কত কি কল্পনা করিতে থাকে: সত্যই যেদিন দেখা হইবে, সেদিন—সেদিন কিন্তু বলিবার মতো কোন কথাই হয়তো খুঁজিয়া মিলিবে না। কি বলিয়া এবং কে প্রথমে আলাপ সুরু করিবে? কে জানে!

সেদিন সকালে সে ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছিল। একটুখানি বিশ্রাম করিবার জন্য একখানি বেঞ্চে আসিয়া বসিল। পাশে দুইটি ভদ্রলোক বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁদের গল্পের একটুক্রো জয়ন্তকে চকিত করিয়া তুলিল।

—হ্যাঁ, সেতার বাজানো শুনলুম বটে সেদিন সিউড়ির সব্-ডেপুটিবাবুর বাড়ীতে। তাঁরই মেয়ে বাজালে। সত্যিই মুগ্ধ হবার জিনিষ।

—রীতিমত যত্ন করে শিখিয়েছেন নিশ্চয়!

—আরে, তা নইলে আর হবার যো কি! একটিমাত্র মেয়ে—শুন্‌লুম এবার ম্যাট্রিক দেবে—নিজের পড়াশুনো আর গান বাজনা নিয়েই আছে আর কি!

—তাই বলুন। ও-সব দাদা, সাধনার জিনিষ! আমারও কি

একদিন কম সখ ছিল! টাকাও কম খরচ করিনি। সেবার সাল্‌খের এক ভদ্রলোকের কাছে—

কথাটা হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল। সব্‌-ডেপুটিবাবু বা তাঁহার মেয়ের আর উল্লেখমাত্র হইল না, যদিও জয়ন্ত রীতিমত উৎকর্ণ হইয়া রহিল। একবার মনে হইল, উহাদের কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া প্রশ্ন করিয়া বসে, কোথায় কোন্‌ দিকে তাঁহাদের বাড়ী, কি নাম সব্‌-ডেপুটীবাবুর, কি নাম বাড়ীখানার? কিন্তু কথা মুখে আসিয়া বাধিয়া গেল। কি মনে করিবে এরা? মেয়েটির গুণপনার ব্যাখ্যা শুনিয়াই হঠাৎ তাহাদের ঠিকানা জানিতে চাওয়া—ইহার চেয়ে অভদ্র আর কি হইতে পারে?

অন্য কি উপায়ে প্রসঙ্গটা তুলিতে পারা যায়, জয়ন্ত যখন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, সেই সময় ভদ্রলোকদুটি উঠিয়া পড়িলেন। হতবুদ্ধি জয়ন্ত শুধু নিঃশব্দে বসিয়া বসিয়া তাহাদের দেখিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়া ভারী একটা ব্যথার মত আটকাইয়া রহিল, বাহিরে আসিতে পারিল না।

নিজেকে সে নিজে বুঝাইল, নিশ্চয়ই এই সেই মলয়া সেন। তাহার মনের যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, নিজের হাতের গড়া যে প্রতিমাটীতে সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত সেতার-বাজানোটা হুবহু খাপ খাইতেছে। তাও শুধু যেমন তেমন সেতার বাজানো নয়। লোকটার কথাটাকে সে বারবার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল,—সত্যই সে একেবারে মুগ্ধ হবার জিনিষ।

হ্যাঁ, সবকিছুই তার এম্‌নি বিস্ময়করই বটে। তাহার ভুবন-ভোলানো জ্যোতির এক-একটী রশ্মিকণাই যে বিশ্বমানবের অন্তর-জয়ের পক্ষে যথেষ্ট! সত্যই কি কোনোদিন সে দেখা পাইবে না সেই জ্যোতির্ময়ীর? ব্যর্থ হইবে তাহার এই পথ চাহিয়া থাকা?

আবার একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা ষ্টেশনের সেই লোকটীর সঙ্গে। জয়ন্ত তাহার বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়াছিল, লোকটি যাইতেছিলেন সাম্‌নের রাস্তা দিয়া। জয়ন্ত আজ আর এ-সুযোগ ছাড়িতে পারিল না। তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—আচ্ছা, আপনি বল্‌তে পারেন, শিউড়ীর এক সাব-ডেপুটী না ডেপুটী—

বলিয়াই জয়ন্ত যেন হাঁপাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন,—ডেপুটীর কথা তো জানিনে, শিউড়ীর একজন সব-ডেপুটী এখানে এসেছেন জানি। মিষ্টার বি, সেন কি?

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলিল,—মিষ্টার সেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেনই বটে! তা তাঁর বাড়ীটা কোন্ দিকে—কি নাম বাড়ীটার—

ভদ্রলোক বলিলেন,—এই তো মুস্কিলে ফেল্‌লেন! এক দিন অনাহূত হয়েই গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ীতে—এইমাত্র। তবে, বাড়ীটার নাম মনে পড়্‌ছে—'শান্তি-কুটীর'!

জয়ন্তর মনে হইল, অনুরোধ করে, সঙ্গে করিয়া একবার বাড়ীটা দেখাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু কি-জানি-কেন কথাটা বলিতে গিয়া বুকটা হঠাৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সুতরাং মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনি বুঝি ঐ বাড়ীটায় থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ 'শান্তি-নিবাসে'।

—ও! আচ্ছা, নমস্কার! বলিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

সেইদিন হইতেই জয়ন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল 'শান্তি-কুটীরের' সন্ধান করে, কিন্তু দেওঘরের মত বিশাল সহরে কোথায় মিলিবে সে বাড়ী? দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা করে, কেহ একেবারেই কিছু বলিতে পারে না, কেহ বা এমন একটা অনিশ্চিত সন্ধান দেয়, যাহার ফলে ঘুরিয়া বেড়ানোই সার হয়। বেশী লোককে জিজ্ঞাসা করিতেও বাধে,

লোকে কি ভাবিবে? বিশেষতঃ যদি কেহ তাহার এই সন্ধানী মনের গোপনতম কারণটুকু সন্দেহ করিয়া বসে—ছি ছি, লজ্জা রাখিবার আর জায়গা থাকিবে না যে? কী অধিকার আছে তাহার এমন করিয়া তাহাদের পিছু লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার? কী সম্বন্ধ আছে? উভয় পক্ষ কেহ কাহারও কোন পরিচয়ই জানে না, অথচ, এই উদ্দেশ্যহীন পাগলামী—

তখনই আবার নিজের মনে সাফাই গাহিয়া বলে, বিশ্বশুদ্ধ প্রত্যেক লোকই তো একটা-না একটা দিক দিয়া অপরের মাপকাঠিতে পাগল। তাই, পাগ্‌লামীর আসলে কোন অর্থই নাই। মানুষের মনের এই পাগ্‌লামীর বীজ শাশ্বত, এবং হয়তো সুন্দরও বটে। আর এই সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়াই বিশ্বের মহাকবির দল চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

দাদা চিঠি লিখিয়াছেন, কি একটা জরুরী কাজে তিনি এলাহাবাদ যাইতেছেন, জয়ন্ত যেন জসিডি গিয়া দেখা করে ৪-৩০ মিনিটের এক্সপ্রেসে।

জয়ন্তর একবার মনে হইল, জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিয়া দাদার সঙ্গে এলাহাবাদ চলিয়া যায়। যে আশার আকর্ষণে সে দেওঘরে রহিয়া গেল, দিন দিন সে যেন সহস্র পাকে তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। অথচ আশা সফল হইবার ক্ষীণতম ইঙ্গিতটুকুও মিলিতেছে না। তাহার চেয়ে বরং বহুদূরে চলিয়া গেলে হয়তো মনের এই অশান্তি ক্রমশঃ নিবিয়া আসিতে পারে। কল্পনার এই দুঃসহ মর্মবেদনা হয়তো বাস্তবের সংস্পর্শে আসিয়া নিস্প্রভ হইয়া আসিতেও পারে।

কিন্তু, তখনই আবার পাল্টা সুর তুলিয়া মন বলে, দেওঘর ছাড়িয়া গেলে দেখা তো কোনদিনই মিলিবে না। এখানে থাকিলে

তবু যে-কোনদিন যে-কোন মুহূর্তে দেখা হইতেও পারে। এই সম্ভাবনাটুকুর দামই যে অনেকখানি!

নিজের কাছেই তখন মনে হয়, দেওঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কল্পনাটা শুধু তাহার আহত মনের ক্ষণিক অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু অভিমান কাহার উপর, তাহাও যে সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না! অথচ একটা ব্যর্থতার অস্পষ্ট বেদনা একখানা ভারী পাথরের মত তাহার অন্তরকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

চাকরকে বাড়ীতে রাখিয়া সে জসিডি গেল দাদার সঙ্গে দেখা করিতে। ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার পরে।

চাকর চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—একজন বাবু আর একটি মেয়ে এসেছিলেন দেখা করতে। এই খামখানা দিয়ে গেলেন, আর এই চিঠিটুকু লিখে রেখে গেছেন।

খামটি তুলিয়া লইয়া জয়ন্ত দেখিল, তাহারই নামের একখানা চিঠি। তারপর কাগজটুকু চোখের আগে ধরিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল,—কে লিখ্‌লে এই চিঠি?

চাকর জানাইল, বাবুটি তাঁহার সঙ্গে চশমা আনেন নাই, তাই তাঁহারই কথামত মেয়েটি লিখিয়া দিয়াছে।

মেয়েটি লিখিয়াছে? আশ্চর্য, আশ্চর্য! জয়ন্ত রুদ্ধ নিশ্বাসে লেখাটি পড়িয়া গেল।

নমস্কার জান্‌বেন।

আপনার একখানা চিঠি পিয়ন ভুল করে আমাদের শান্তি-কুটীরে ফেলে গিয়েছিল, তাই আপনার চাকরের কাছে রেখে গেলাম। লোকমুখে শুন্‌লাম, আপনি নাকি আমার খোঁজ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার অবকাশ পেলাম না। কারণ, আজই সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে আমরা চিটাগঙ্গে যাচ্ছি। নমস্কার।

—বিমলেন্দু সেন।

বিমলেন্দু সেন! কিন্তু এই লেখা—ঠিক সেই লেখা—যে-লেখার প্রতি অক্ষর, অক্ষরের প্রতিটি ভঙ্গিমা তাহার বুকের সঙ্গে গাঁথা হইয়া গিয়াছে! সেই মলয়ার লেখা! সেই মলয়া সেন! তাহা হইলে সে আসিয়াছিল—আসিয়াছিল তাহারই বাড়ীতে! অথচ—

চাকরটা দাঁড়াইয়া ছিল। জয়ন্ত হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—হতভাগা রাস্কেলের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাক্‌বে, একটুখানি বস্‌তে বল্‌বার ভদ্রতা—

আর কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। টেবলের উপরকার টাইম্‌-পিস্‌টাতে টুং টুং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল।

দুর্যোগে

ঝড়ের এমন অপরূপ মূর্তি আমি জীবনে কখন দেখি নাই। কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে আকাশ ও মাটিকে মথিত করিয়া এমন বিরাট ঝড় উঠিয়া পড়িল তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই, করিবার কথাও নয়।

হঠাৎ মনে হইল, চারিদিকের ছোটবড় গাছগুলা সব সত্যই পাগল হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে শুধু নানা রকমের শব্দ। বাতাসের যে এত রকমারি শব্দ আছে, তাও কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কখন কান্নার মত খানিকটা গোঙানি শব্দ, কখন বাঁশির মত তীক্ষ্ণ সরু আওয়াজ। উন্মত্ত গাছগুলা অসংখ্য হাত মেলিয়া একবার আকাশপানে উঠিতেছে, তখনি আবার মাটির দিকে ঝুঁকিয়া নিজেই নিজের শিকড় পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিবিড় কালো মেঘের স্তর নিজেকে বিস্তীর্ণ করিতে করিতে সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। এইভাবে ডানা মেলিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করিতে ওর আর অধিক বিলম্ব হইবে না বোধ হয়।

ছুটিতে শুরু করিয়াছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত কষ্টে। প্রতিপদেই মনে হইতেছে, হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছি এবং দুই পা ছুটিতেছি ত দুই পা পিছাইয়া পড়িতেছি।

মাঠের উপর একখানা পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ঘর। কে কবে কি উদ্দেশ্যে তৈয়ারী করিয়াছিল কে জানে। মনে হয়, উদ্দেশ্য তার একটি

দিনের জন্যও সফল হয় নাই। নূতন অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইয়া আজ তাহার এই জীর্ণ শোচনীয়তা। কিন্তু সেই অর্ধসম্পূর্ণ ঘর আজ আমার কাজে লাগিয়া গেল।

বৃষ্টিও সুরু হইয়াছে। এই ঝড়বৃষ্টির মাঝখানে এ-হেন ভাঙ্গাঘরে আশ্রয় লওয়া যে আরও বিপজ্জনক, সেটুকুও মনে হইতেছে। কিন্তু নিরুপায়। এখনি হয়তো জোরে শিলাবৃষ্টি সুরু হইবে। ঘরচাপা পড়িয়া মরিতেই যদি হয়, তবুও উপায় কিছু নাই। এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব।

সুতরাং ঘরের ভিতরেই চুপ্‌চাপ্‌ আসিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা-দরজাগুলা কে কবে খুলিয়া লইয়া গিয়া নিজেদের কাজে লাগাইয়াছে। জলের ঝাপ্‌টা আসিয়া ঘরের মেঝে পর্যন্ত ভিজাইয়া দিতেছে। মাথার উপর একটা ছাউনি তবু ত আছে, যতক্ষণ না সেটা ধ্বসিয়া মাথার উপর পড়ে, ততক্ষণ মরিবার ভয় নাই।

এমনি করিয়া খানিকক্ষণ কাটিল। একা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের ঝড় দেখিতেছি, এমন সময় একটা অনির্বচনীয় ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ আর-একটি প্রাণী ঝড়ের মাঝখান হইতে দম্‌কা বাতাসেরই একটা টুক্‌রার মত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। তার পানে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। নিঃসঙ্গ একটি মেয়ে, বয়স বেশী নয়, গায়ে পরিষ্কার ধোপদস্ত একখানি সাদা সাড়ী। জলে আগাগোড়া না ভিজিলেও কাপড় জামা অনেকখানিই ভিজিয়াছে এবং মাথার চুল এলোমেলো হইয়া গেছে। কোঁক্‌ড়া কয়েকটা অলকগুচ্ছ কপালে গালে লাগিয়া আছে।

এই দারুণ দুর্যোগের ভিতর কোথা হইতে এবং কেমন করিয়াই বা আসিল ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কিন্তু তখন কৌতূহলের চেয়ে উৎকণ্ঠাই মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বেশী। তার অসহায় বিপর্যস্ত চেহারা দেখিয়া কেবল এই কথাটাই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে

নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এই বিপন্না মেয়েটিকে আমি কি কোন কিছুই সাহায্য করিতে পারি না ?

বাহিরে বৃষ্টি বেশ জোরে নামিয়াছে, ঝড়ের বেগও এতটুকু কমে নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অনুর্বর মাঠ আর তার উপর নানারকমের গাছ। তাদের পাতা ছিঁড়িয়া ডালপালা ভাঙ্গিয়া ঝড়ের এই রণতাণ্ডব চলিয়াছে। উদ্দাম বায়ু এক একবার গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিকণা উড়াইয়া চোখের সাম্‌নে কুয়াসার মত একটা পর্দা সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া কিছুই আর দেখা যাইতেছে না।

কবাট-হীন জানালা দরজা দিয়া জোরে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ঢুকিতেছে। মেয়েটি দরজার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। আমি বলিলাম, ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চেন কেন ? এই কোণে এসে দাঁড়ান্। বলিয়া নিজে যে কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারই অদূরে একটু স্থান নির্দেশ করিলাম। মেয়েটিও কোন কিছু দ্বিধা না করিয়া আমার প্রায় পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার একটু যেন কিন্তু-কিন্তু ঠেকিতেছিল। মেয়েটি একটুখানি ক্ষীণ হাসিয়া বলিল,—আপনি কিন্তু আমার আগেই এসেছেন। আপনার জায়গাটা দখল করা আমার খুব অন্যায় হচ্ছে।

বলিলাম,—বেশ ত ! আমি ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

সাম্‌নের কোণে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—ওখানে যাওয়া কিন্তু আমারই উচিত ছিল—আপনি যখন আগে এসেছেন।

আমি শুধু একটু হাসিলাম। কোন জবাব দিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, এই মাঠের উপর দিয়া একা সে কোথায় বাহির হইয়াছিল। কিন্তু আড়ষ্ট জিহ্বার উপরই কথাটি জড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই মনে হইল, কি দরকারই বা আমার ওকথা জানিতে চাহিবার। যেমন করিয়া এবং যেখান হইতেই ও আসুক, সম্পূর্ণ

অপরিচিত দুটি প্রাণীতে আমরা এই জীর্ণ ঘরের আশ্রয়তলে দাঁড়াইয়া আছি; এবং আমাদের ঘিরিয়া প্রকৃতি মহাপ্রলয়ের আস্ফালন সুরু করিয়াছে। চোখে যতদূর দেখা যায়, কোথাও একটি মানুষও নজরে পড়ে না। মনে হইতেছে, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মাঝখানে শুধু আমরা এই দুটি প্রাণী, বাকী সকলেই বুঝি মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই সত্যটাকে ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার কবি-মনের মাঝখানে এই অপূর্ব রোমান্সটুকু অপরিচয় এবং অজানার পটভূমির উপর বেশ উজ্জল হইয়াই ফুটিয়া উঠিল। ইহার বেশী জানিতে চাওয়া হয়তো মূঢ়তাই হইবে।

হঠাৎ মেয়েটি চীৎকার করিয়া উঠিল।

—সর্বনাশ! শীগ্‌গির চলে আসুন ওখান থেকে। দেখছেন না, আপনার মাথার ওপর কতখানি বড় একটা ফাট ধরেছে! শীগ্‌গির চলে আসুন।

বাধ্য হইয়া আমাকে সরিয়া অসিতে হইল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করিল, সামনে একটা গাছের গুঁড়ির খানিকটা অংশ পড়িয়া রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সানন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল,—বাঃ, এইত চমৎকার বসবার জায়গা পাওয়া গেছে। আসুন, কাঠটাকে ঐ কোণ ঘেঁসে সরিয়ে নিয়ে যাই।

দুজনে কাঠটাকে গড়াইয়া-গড়াইয়া আমাব পূর্ব-অধিকৃত কোণে ঠেলিয়া আনিলাম। মেয়েটি বলিল,—বসুন। এইখানে বসে দিব্যি গল্প করা চলবে।

আমি বসিলাম। সেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া আমার পাশে বসিল এবং বসিয়াই খুব একচোট খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল,—এইবার ঝড়জল যতক্ষণ চলে চলুক আর ভয় করিনে। ভাগ্যিস এখানে আপনি ছিলেন! নইলে একা এই ঘরের ভেতর যে কী করতুম!

মনটা জুড়াইয়া গেল। 'ভাগ্যিস আমি ছিলাম!' যেন আমি

ওর কত যুগ-যুগের পরিচিত! তখনি আবার মনে হইল, তা মিথ্যাই বা কি! এম্‌নি একান্ত নির্ভরতাই ত শুধু অপরিচয়ের ব্যবধানটাকে সঙ্কীর্ণ এবং নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারে! নহিলে এ-জগতে পরিচয়ের ভিত্তিই বা কোথায়!

আমি তার মুখের পানে চাহিলাম। সুন্দর সুগঠিত মুখখানি। গায়ের রঙটিকে হয়তো কালোই বলিতে হয়, কিন্তু সেই কালোর উপর একটা অপূর্ব স্নিগ্ধতার অবলেপ যেন এই রঙটির সঙ্গে দৃষ্টির অনধিগম্য অন্তরের একটা সহজ সংযোগ রাখিয়াছে। গাছের মধ্যে ফুলকে দেখিতে ভাল লাগে, কিন্তু আমার মনে হয়, তার শাখাপ্রশাখা পরিব্যাপ্ত করিয়া তার সবুজের সুষমাটুকুতে চোখ যেন জুড়াইয়া যায়। ঐ মেয়েটির পানে চাহিলেও যেন ঠিক তেমনি—চোখ যেন না জুড়াইয়া পারে না।

দুজনে একই সঙ্গে বাহিরের পানে চাহিয়াছিলাম। একটা পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডাল বাতাসে ঘুরিতে-ঘুরিতে যেন মাটিতে পড়িবার জায়গা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

মেয়েটি বলিল,—ফুলগুলো কি চমৎকার! জলে ভিজে যেন আরও বেশী তাজা হয়ে উঠেছে।

ইচ্ছা হইতেছিল, ঝড়ের ভিতর ছুটিয়া গিয়া সেই ফুলসমেত শাখাটা আনিয়া ওর হাতে দিই। সত্যই বোধ হয় উঠিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—পাগলামী ক'রোনা। তুমি চলে গেলে আমার একা ভারী ভয় করবে।...কী নিষ্ঠুর তুমি! এই দুর্যোগের মাঝখানে একা আমায় ফেলে রেখে চলে যেতে চাও! এখুনি যদি—

তাহার কথা শেষ হইতে-না-হইতে সাম্‌নের ঘোলাটে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ নাচিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কী ভীষণ গর্জন! নিকটেই কোথায় বাজ পড়িল বুঝি!

মনের উপর হইতে সেই ভয়ঙ্কর শব্দের রেশটুকু মিলাইতে-না-মিলাইতে আবার শিহরিয়া উঠিলাম। দুখানি বাহুর নিবিড় বন্ধন আমার দেহকে ঘিরিয়া। মেয়েটি ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িল বুঝি!

ধীরে ধীরে আমি তার হাতছুটি সরাইয়া দিতে সে মাথা তুলিয়া ফ্যাকাসে মুখের উপর এক ঝলক হাসি ঢালিয়া দিয়া বলিল,—মাগো! এম্‌নি ভয় করছিল! আর তুমি কি না আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছিলে?

আমি বলিলাম,—কৈ, যাইনি ত আমি!

অভিমানে গলা কাঁপাইয়া সে বলিল—যাচ্ছিলে বৈকি! এম্‌নি ঝগড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সঙ্গে!

কথন্ হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। বাতাসের ফাঁকা গর্জনটুকু কমিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে কোথাও এতটুকু শব্দ পর্যন্ত নাই। গাছগুলা যেন সহসা নিশ্চেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমের আকাশ হইতে খানিকটা অপরূপ লাল আলো আসিয়া বিধ্বস্ত ধরিত্রীর মুখে হাসি ফুটাইয়াছে।

মেয়েটিও হাসিয়া উঠিল। কিন্তু আগের সে হাসিতে আর এখনকার হাসিতে কতখানি পার্থক্য! সে বলিল,—আঃ বাঁচলুম! এতক্ষণে ঝড়বৃষ্টি দু-ই থেমেছে।······আপনি বাড়ি যাবেন না?

জবাব দিলাম,—যাবো বৈকি!

সে বলিল,—হ্যাঁ যান্। আমিও চল্‌লুম।···আচ্ছা, নমস্কার!

আমি হয়তো হাত উঠাইয়া নমস্কার করিতেই যাইতেছিলাম, কিন্তু হাত উঠিল না।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

পাশের খোলা জানালাটা দিয়া হু-হু করিয়া বাতাস ঢুকিতেছে। বাহিরে সত্যই খুব ঝড়বৃষ্টি হইতেছে বুঝি! স্বপ্নে যে মেঘগর্জনের শব্দ শুনিলাম, সেটা হয়ত সত্যই শুনিয়াছিলাম।

কিন্তু কি-যে অপূর্ব স্বপ্ন! বিছানার একপাশে আমার লেখার খাতা আর কলমটা পড়িয়া আছে। কি যেন একটা লিখতে সুরু করিয়াছিলাম। কি-যে লিখিয়াছি এক বিন্দু-বিসর্গও স্মরণ নাই। লেখায় কিছুতেই মন বসিতেছিল না, তাই খাতা-কলম ছাড়িয়া হতাশায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম।...

শুইয়া-শুইয়া কত-কি এলোমেলো কথাই ভাবিতেছিলাম। বেশীর ভাগই নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই। বারম্বার মনে হইয়াছিল, কবির ভাষায় জীবন-সংগ্রাম বলিয়া যে কথাটা শুনিয়া আসিয়াছি, তাহার সত্যকার রূপটা এমন করিয়া চোখের সামনে না-দেখিলে কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। এই সংগ্রামের মাঝখানে সাময়িক সন্ধি করিয়া কল্পনার রঙীন প্রাসাদ গড়িয়া তোলা যে কতবড় হাস্যাস্পদ প্রচেষ্টা! মনে মনে এই ধরণের একটা অস্পষ্ট কল্পনা করিতেছিলাম, যেন আমি কোন্ মহাদুর্যোগের ভিতর দিয়া জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, কবে যে এ দুর্যোগের অবসান হইবে কে জানে! এবং এমনি কল্পনা মাথায় লইয়াই কখন হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই নিদ্রার মাঝেও দুর্যোগকে এড়াইতে পারি নাই।......

বাহিরে সত্যকার দুর্যোগ কিন্তু এখনো থামে নাই, বোধ করি সমান তেজেই চলিতেছে। কিন্তু এ দুর্যোগের মাঝে সেই পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার নামগন্ধও বুঝি নাই। কিম্বা আছেও হয়তো। হয়তো এই নিবিড় অন্ধকারের কোন্‌খানে ঝড়ের মুখে পড়িয়া অমনি একটা কৃষ্ণচূড়ার ফুলসমেত ডাল বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া নীচে পড়িবার জায়গা খুঁজিয়া

পাইতেছে না। কিন্তু, কোনো দরদীই হয়তো সেটাকে ধরিবার জন্য অন্ধকারে ঝড়ের মুখে ছুটিয়া বাহির হইতে যাইতেছে না!

...অপূর্ব স্বপ্ন আর অপূর্ব কল্পনা! বিশেষ করিয়া আমার বর্তমান জীবনে। হয়তো পৃথিবীতে আছেও কেউ, যার জীবনে এই অপরূপ স্বপ্ন বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে; যার জীবনে দুর্যোগ আসিয়াছে শুধু বসন্তকে প্রত্যুদগমন করিবার জন্যই!

আছে বৈকি! সংসারে সব কিছুই আছে। আমার জীবনে নিরবচ্ছিন্ন দুর্যোগ চলিয়াছে বলিয়া পৃথিবী তো মরুভূমি হয় নাই! আর হয় নাই বলিয়াই এখনো আমরা বাঁচিয়া আছি। বাঁচিয়া আছি আমার কল্পনা আর এই লেখনীর সম্বলটুকু লইয়া।

আবার খাতা-কলম টানিয়া লিখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু অসম্ভব। মাথার প্রতিটি শিরায় শিরায় স্বপ্নটা এখনো তাজা হইয়া রহিয়াছে। এখনো যেন কাণে বাজিতেছে, একটি অত্যন্ত মধুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, 'আচ্ছা নমস্কার'। মানুষটিকে যেন আর কল্পনায় ধরিতে পারিতেছি না, কিন্তু বিদায়ক্ষণের ঐ সংক্ষিপ্ত কথা দুইটি এবং নির্মমতার সেই অপরূপ ভঙ্গীটি বোধ হয় কোনোদিনই ভুলিতে পারিব না।

পাশের টাইম্‌পিস্‌টায় টিং টিং টিং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। রাত্রি তো শেষ হইয়া আসিয়াছে! হঠাৎ মনের ভিতর ভিড় করিয়া আসিল কুৎসিৎ দিবালোকের যত-কিছু কাহিনী। সেই একঘেয়ে সংসারের রকমারি চাহিদা আর নিজের শোচনীয় অক্ষমতা, এই দুয়ের চিরন্তন সংগ্রাম! অতসী তো সেদিন স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে, অতঃপর এভাবে আমার সংসার চালাইতে সে পারিবে না।

সেদিন কথায় কথায় ঝগড়াটা একটু বেশী মাত্রা পর্যন্তই উঠিয়াছিল, নহিলে আমার সঙ্গে এভাবে পূরা তিন দিন কথা বন্ধ করিয়া অতসী কখনো থাকিতে পারে নাই। কিন্তু, আগের সব কথাই তো আলাদা! তখন কল্পনাকে সত্য বলিয়া ভাবিবার অবস্থা ছিল

আমারও অতসীরও। কিন্তু, আজ আমার যদি-বা আছে, অতসীর নাই একেবারেই। তাই, যে অতসী একদিন আমার লেখার পরম অনুরাগিণী ছিল, সে আজ হয়তো আমার এই খাতাপত্রগুলোকে রান্নাশেষের উনানে গুঁজিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যায়। রান্নাশেষের বলিলাম, কেন না, এই সব জঞ্জালকে পুড়াইবার জন্য কয়লা খরচ করিতেও সে রাজী হইবে না বোধ হয়।

কথা অবশ্য আমিও বলি নাই। আমিও তো বলিতে পারিতাম, যেমন আগে কতদিন সাধিয়া কথা বলিয়াছি। কিন্তু এখন মনে হয়, মিথ্যা এই সাধাসাধি! ভাঙ্গা বাঁশীতে মানভঞ্জনের সুর আর বাজে না।

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, কাল তো ইংরেজী মাসের পনেরো তারিখ। তাই তো, কি মুস্কিল! খোকার ইস্কুলের মাহিনা দিবার শেষ তারিখ! মাহিনা দিতে না পারিলে সে কাঁদিয়া কাটিয়া একশেষ করিবে। ঠিক মায়ের মতই অভিমানী! অতসী হয়তো তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিত, কিন্তু করিবে না, কারণ আমার প্রতি তিনি এখন যুধ্যমানা।

টিং টিং টিং টিং। চারটা বাজিয়া গেল। নাঃ আর ঘুম আসিবে না। মগজের ভিতর হইতে স্বপ্নের আমেজটুকু যদিও মুছিয়া গিয়াছে, তবু সেখানে ভিড়ের শেষ নাই। ছেলেরা মাহিনা, বাড়ী-ভাড়া, অতসীর নির্বাক গৃহিণীপনার অসহ্য গুমোট,—এই গুমোটের মাঝে ঘুম অসম্ভব।

সকাল হইল। রোজ যেমন হয়, অর্থাৎ গত তিন দিন যেমন হইতেছে। মেয়েকে দিয়া অতসী চা পাঠাইয়া দিল। নিজে একটি কথাও বলিল না, একবার সামনে আসিয়াও দাঁড়াইল না। ইচ্ছা

হইল, পেয়ালাটা ফেরত দিই। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝিলাম, এ অভিমান একেবারেই নিরর্থক। এক কাপ চা পর্যন্ত না ঢালিলে বেচারা উদরকে সেই বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। সুতরাং চায়ের বাটীতে চুমুক দিতেই হইল।

কি-জানি-কেন ছেলে মাহিনা না চাহিয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। একবার একথা মনে করিয়া আরাম উপভোগ করিতে গেলাম যে, অতসী ওটা নিজে হইতেই দিয়াছে, কিন্তু সেটুকু ভাবিবারও উপায় ছিল না। সেদিন তার বাক্স হইতে শেষ একটি টাকা আমি নিজেই চুপি চুপি বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। তাহারই সূত্র ধরিয়া তো যত অনর্থের সৃষ্টি! অতসী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—তার প্রতিজ্ঞার কথা তো আগেই বলিয়াছি।

কি কথায় যে কি কথা আসিয়া পড়িল সেদিন! অতসীর রাগ করিবার কারণের তো সত্যই অভাব নাই! বড়লোকের মেয়ে, আমার সংসারে পড়িয়া দিনরাত কত কষ্টই না সহিতে হইতেছে! তাহার ছোটখাটো অনুযোগের উত্তর করিতে না গেলেই হয়তো সকল গোলযোগ চুকিয়া যায়। কিন্তু, পাছে স্বামীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য জবাব না দিয়াও পারি না।

সময়ে সময়ে ভাবি, অতসী কেন আমার সংসারে আসিল, আর কেমন করিয়াই বা আসিল! ঠিক যেন সেই স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির মতই ঝড়ের মুখে পথ হারাইয়া যেখানে পাইল সেইখানেই আশ্রয় লইল নাকি? কে জানে!

আজ রবিবার।

বেলা ন'টার ট্রেণে অতসীর বড়দাদা মন্মথবাবু আসিয়া হাজির। সেক্রেটারিয়েটে মোটা মাহিনার চাকরী করেন। বেশ ভারিকি চালে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে, ভালো আছো ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখানকার সব ভালো?—প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম।

কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। হঠাৎ না-বলিয়া-কহিয়া এমন করিয়া ওঁর শুভাগমনের তাৎপর্যটা কি? অতসী লিখিয়াছিল নাকি? কে জানে?

ছোট মেয়ের মারফৎ অতসী টাকা চাহিয়া পাঠাইল। শেষ সম্বল দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম। এবং বলিয়া দিলাম, এই দুটী টাকাই সম্বল, একটু বুঝিয়া খরচ করা হয় যেন!

বাহির হইতে অতসীর ঝাঁঝালো জবাব আসিল।

—আমার দাদা আমার বাড়ীতে লুচি আর মাছের মুড়ো খেতে আসেন নি। সুতরাং ও খোঁচাটুকুর দরকার ছিল না।

আমার ঠোঁটের উপরও একটা বেশ উত্তপ্ত জবাব ঠেলিয়া উঠিল, কিন্তু চাপিয়া গেলাম। তাহার উত্তাপে আমার নিজের বুকের ভিতরই জ্বালা করিয়া উঠিল।

বৈকালের দিকে মন্মথবাবু বলিলেন—হ্যাহে নীরেন, বলছিলুম কি, অতসীকে দিনকতকের জন্যে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই। তোমার আপত্তি নেই তো?

কোনরকম না ভাবিয়াই বেশ সহজ হাসিমুখে জবাব দিলাম, আজ্ঞে, এর আর আপত্তি কি!

ব্যাপারটা যেন এতক্ষণে বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। অতসী তাহা হইলে দাদাকে চিঠি লিখিয়াছিল, আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য। তা, অতি উত্তম কথাই তো! শুধু আমাকে জানাইয়া লিখিলেই বা ক্ষতি ছিল কি! শুধু জানানো মাত্র। আর, তাও যদি না-জানাইল, তবে এখন আবার এভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করানোর অর্থটাই বা কি? ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছুই নয় তো!

মাথার ভিতরটা হঠাৎ যেন রীতিমত তাতিয়া উঠিল। মনে হইল,

এখনি অতসীর কাছে গিয়া খুব গোটাকতক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। মনে হইল, বলি, তুমি যেখানে খুসি যাইতে পার, ছেলে মেয়েরা আমার কাছেই থাকিবে। কিংবা না, তাই বা কেন বলিব? অনুমতি না লইয়া তাহাকেই বা যাইতে দিব কেন? স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে নিজের অধিকার আমরা কোনোদিনই ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারি না। তা যতই সভ্য হই না কেন!

কিন্তু, কাহাকেও একটি কথাও বলিতে পারিলাম না। শুনিলাম, মন্মথবাবু সন্ধ্যার ট্রেণেই যাইবেন উহাদের সঙ্গে লইয়া।

কাঁধের উপর পাঞ্জাবীটা ফেলিয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। মন্মথবাবু বলিলেন,—কোথায় চল্‌লে হে?

—আজ্ঞে, এই—টিউশনিটা—

—ও! আচ্ছা টিউশনি করছো তো—রবিবারেও কামাই নেই!

জবাব না দিয়া শুধু একটু হাসিলাম। সত্যই, রবিবারে টিউশনি করিতে যাই না, তবু আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে না থাকটাই অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক করিয়াছিলাম, উহারা চলিয়া গেলে তবে বাড়ি ফিরিব।

তাই কোনো কিছু না ভাবিয়াই সিনেমায় ঢুকিয়া পড়িলাম। অবশ্য প্রেক্ষাগৃহে নয়, উহাদের অফিসঘরের আড্ডায়।

সেখানে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত কাটাইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

ভিতরে সব চুপচাপ। ঠিক যেমনটি অনুমান করিতেছিলাম। তাহা হইলে সত্যই ইহারা চলিয়া গিয়াছে। দরদালানের একপাশে মিটমিট করিয়া হ্যরিকেনটা জ্বলিতেছে, আর পাশে বাচ্ছা চাকরটা ঘুমাইতেছে।

আমি তার গায়ে ধাক্কা দিয়া তুলিলাম। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চোখ কচ্‌লাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—ওদের তুলে দিতে যাস্‌নি তুই?

সে জবাব দিল,—আজ্ঞে, মামাবাবু তো গাড়ী করেই গেলেন।

রাগিয়া বলিলাম,—গাড়ি করে যাবে না তো হেঁটে যাবে নাকি? তোর মা কিছু বলে যায় নি?

সে কিছু জবাব দিবার আগেই পাশ দিয়া কে অতি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। হ্যারিকেনের সেই আবছা আলোতে কেমন একটু চমক লাগিল।

সন্দেহ হইল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। বলিলাম, কি আশ্চর্য! তুমি যাওনি?

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব।

—না!

তারপর হাঁড়ি হইতে ভাত-বাড়ার কাজ অতি নিঃশব্দেই চলিতে লাগিল।

বলিলাম, কিন্তু······গেলে না যে?

—তার জবাবদিহি করতে পারবো না আমি। তাতে তুমি যা-খুসি করতে পারো।

শুধু বলিলাম, গেলেই কিন্তু ভালো করতে।

তারপর আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িলাম এবং মুখ হাত ধুইয়া আহারে বসিলাম।

অতসী সামনে বসিয়াছিল একটিও কথা না কহিয়া। আমি আস্তে আস্তে বারকয়েক তার মুখের পানে দেখিয়া লইলাম। সেই নির্মল আকাশে দুর্যোগ এখনো একেবারে কাটে নাই। মেঘে থম থম করিতেছে। হঠাৎ ঝড় উঠিবে কি বর্ষণ সুরু হইবে কিছুই আন্দাজ করিবার উপায় নাই। হয়তো কিছুই হইবে না, এমনি গুমোট করিয়াই থাকিবে আরো কয়দিন কে জানে!

একবার আস্তে আস্তে বলিলাম, কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি।

তারপর একটু থামিয়া বেশ একটু জোর দিয়া বলিলাম, অদ্ভুত স্বপ্ন।

তারপর আরো কয়েকগ্রাস ভাত মুখে পুরিয়া বলিলাম, সত্যিই। সে আমার গল্পের চেয়েও অলৌকিক, জানো অতসী!

অতসী কোন কথাই বলিল না। ওদিকে মুখটা একবার ফিরাইয়া লইল। সেটা ঠিক উদ্গত হাসি চাপিবার জন্যই কিনা, বোঝা গেল না।

কিন্তু, সে-সময় আর কিছু বলা হইল না। আহারাদির পর বাহিরের খোলা বারান্দার উপর মাদুর বিছাইয়া অতসী শুইয়া পড়িয়াছিল। আমি আস্তে আস্তে পাশে আসিয়া বসিলাম।

বলিলাম,—কালকের স্বপ্নের কাহিনীটা শুনবে না অতসী? সত্যিই কী-যে বিচিত্র স্বপ্ন!

অতসী ছোট্ট করিয়া জবাব দিল, শুনবো।

আমি তখন স্বপ্নের কাহিনীটা বলিয়া চলিলাম। শেষ পর্যন্ত শুনিয়া অতসী বলিল, বেশ বেছে-বেছে মন-গড়া স্বপ্ন দেখতে শিখেছো তো! তাই বুঝি আমাকে দাদার সঙ্গে বিদেয় করতে চাইছিলে?

—আমি বিদেয় করতে চাইছিলুম? বরং আমি ভাবলুম, তুমিই রাগ করে চলে যাবে বলে দাদাকে চিঠি লিখে আনিয়েছ!

—আর এখন কি মনে হচ্ছে?

—এখন? এখন মনে হচ্ছে……কালকের ঐ স্বপ্নটার কথা যতই ভাবছি, ততই কত-কি যে মনে হচ্ছে, জানো অতসী?

—কি শুনি?

—মনে হচ্ছে, তুমিও একদিন ঠিক অমনি করেই পথ হারিয়ে হঠাৎ আমার জীবনের এই জীর্ণ ছাউনির নীচে এসে আশ্রয় নিয়েছিলে! তারপর চলেছে এই নিরবচ্ছিন্ন দুর্যোগ। এই দুর্যোগের ভেতর দিয়ে আমরা দুজনে দুজনকে কী নিবিড়ভাবেই চিনলুম! মনে

হয় এ-চেনার জন্ম-জন্মান্তরেও বুঝি শেষ হবে না। দুঃখ কষ্টে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠো অতসী, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো ? আমাদের ঘিরে অবিরত এই ঝঞ্ঝা-ঝাপট চলেছে বলেই তোমাকে আমি এমন ঘনিষ্ঠতম করে পেয়েছি। এবং থেকে থেকে এমনও ভয় হচ্ছে, যদি কোনোদিন এই দুর্যোগ থেমে গিয়ে আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেদিন তোমাকেও আমি হারাবো। সেদিন তুমিও হয়তো ঠিক অমনি করেই ঘাড় দুলিয়ে বলবে, 'আচ্ছা, নমস্কার !'

অতসী উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহার দুইটি চোখ আমার চোখের উপর জ্বলিতেছিল। সামনের আকাশের ঐ নক্ষত্রের মতই ভাস্বর তারা !

মাথাটিকে তার বুকের কাছে আকর্ষণ করিলাম। কাঁচা তেলের গন্ধ তার মাথায়, কিন্তু সেই নিবিড় চুলের গন্ধ জগতের সমস্ত সুবাসকেই হার মানাইয়াছে।

ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সে বলিল, বেশ আছো তোমার কল্পনা নিয়ে, না ? শুধু ঐ 'কথা'ই শিখেছ আর কি !

তৃতীয়ার চাঁদের ফিকে আলোয় অতসীর চোখদুটি অশ্রুতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

যার যেথা ব্যথা

মালতী তার স্বামীকে চিঠি লিখিতেছিল। না লিখিয়া উপায় নাই ; চিঠি না পাইলে বাবুর ভারী রাগ হয়। অথচ চিঠি লিখিবার তার কত যে অসুবিধা এখানে, তা তো বোঝে না! কাগজ, দোয়াত, কলম—এ সব কোথায় যে থাকে, তা খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। নানা প্রলোভনে ছোট্ ভাইটিকে বশীভূত করিয়া তবে লিখিবার সরঞ্জামগুলির জোগাড় হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক লাইন লিখিবার পর আর চিঠির খোরাক খুঁজিয়া মেলে না। অথচ চিঠি নিতান্ত ছোট হইলেও বাবুর মন ওঠে না! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মালতী লিখিল :—

"এ জায়গাটা মন্দ নয়। চারিদিক ফাঁকা। ও-পাশে শুধু একখানা একতলা বাড়ী। আমাদের দোতলার ঘর থেকে তার ভেতরের অনেকটা দেখা যায়। শুন্‌লুম, ও-বাড়ীর বৌটি গেছে বাপের বাড়ী, শীগ্রি আস্‌বে। সে এলে কিন্তু আমি খুব খুসী হবো। গল্প করবার লোকের তখন আর অভাব হবে না।......"

বাক্সের ভিতর হইতে সে ঠিকানা-লেখা খামখানি বাহির করিল ; তাহাতে চিঠিটা পুরিয়া মোড়ক আঁটিয়া ভাইকে তাহা ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইল। তারপর দরদালানের একপাশে, যেখানে বৃদ্ধা ঠাকুরমা—তাহার বাপের পিসীমা—একরাশ তেঁতুল ঢালিয়া বীজ কাটিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া বসিল।

—আমি তেঁতুল কাট্‌বো, ঠাকুমা!

—বরকে চিঠি লেখা শেষ হ'লো রে ?

—ধ্যেৎ! কে বল্‌লে আমি চিঠি লিখ্‌ছিলুম ?

—লিখে আবার মিছে কথা বল্‌ছিস্‌ কেন ভাই ? আজকাল-কার মেয়েদের চিঠি নইলে কি প্রেম করা হয় রে ?

মালতী একখানা বঁটি টানিয়া-লইয়া হাসিয়া বলিল,—তা তোমাদের বয়েস-কালে ও-বিদ্যে ত কেউ জান্‌তো না ঠাকুমা !

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন—সেদিন ও-বাড়ীর বাবুটির একখানা চিঠি ভুল ক'রে পিওন আমাদের বাড়ীতে দিয়ে গিয়েছিল। আমি দেখেই বুঝ্‌তে পারলুম—গিন্নী লিখেছেন বাবুকে বাপের বাড়ী থেকে।

মালতী হাসিমুখেই বলিল,—তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে হচ্ছিল—সেটা খুলে পড়্‌বার ?

—তা ভাই, পড়্‌তে জান্‌লে কি আর না-পড়তুম ?

মালতী বলিল,—বৌটা এলে কিন্তু আমি বাঁচি ! বাবা বেছে-বেছে এমন জায়গায় বাড়ী কর্‌লেন যে, কারো সঙ্গে একটা কথা কইবার যো নেই ! আচ্ছা, ও-বাড়ীটা ওরা দোতলা কর্‌লে না কেন ঠাকুমা ?

—ও-বাড়ী ওদের নিজেদের না কি যে দোতলা করবে ? দোতলা করা অমনি মুখের কথা কি না ?

—বৌটা তোমাদের সঙ্গে কথা কয় ?

—ও মাগো ! ও-সব হচ্ছে ফেসিয়ান্‌ সুন্দরী মেয়ে যে গো, আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কি ?

—খুব সুন্দরী বুঝি ?

—তা, রঙটা কটা বৈ কি ! হ্যাঁ, খুবই কটা। যাকে তোমরা বল ফর্সা। মুখ-চোখও মন্দ না। তার ওপর শুন্‌লুম আবার হারমোণি বাজিয়ে গান গায়। যেন চূড়োর ওপর ময়ুরপাখা ! আমরা হলুম বুড়ো-হাবড়া সেকেলে মনিষ্যি। তুই এসেছিস্‌, তোর সঙ্গে যদি কথা-টথা কয়।

মালতী একমনে বীজ কাটিয়া তেঁতুলগুলা ঝুড়িতে রাখিতে লাগিল। ঠাকুরমার মন্তব্য শুনিয়া কোন কথা বলিল না।

উত্তরে মালতীর স্বামী লিখিয়াছে,—"সেখানে তোমার এক সঙ্গী খুঁজে পেয়েছ জেনে খুব খুসী হলুম। এতদিনে বোধহয় তার সঙ্গে তোমার রীতিমত আলাপ জমে গেছে। গল্প পেলে তোমার তো খাবার কথাই মনে থাকে না! তার সঙ্গে আলাপে মস্‌গুল হ'লে, ভয় হয়, পাছে আমাকেও একেবারে ভুলে যাও।"

মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া নিজের মনে মালতী বলিল,—ঢঙ্!...

চিঠিতে লিখিল,—"আমার যেমন বরাত! বৌটার কথা যা শুন্‌লুম, তাতে ওর সঙ্গে ভাব করবার সখ আমার আর নেই। মাগো! যা দেমাক্ তার! বড়লোকই না হয় হ'লো, তা তার জন্যে এতো গুমোর মানুষের যে কি ক'রে হয়, তা তো বুঝ্‌তে পারিনে।"

শেষের কয়টা ছত্র লিখিতে গিয়া মালতীকে আবার একখানা কাগজ খরচ করিতে হইল। প্রথমে লিখিয়াছিল, বৌটি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু লিখিবার পর মনের কোন্‌খানে কি যেন একটা খোঁচা খচ-খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। নিজে যে সে কালো, এটা যতই অস্বীকার করিবার ইচ্ছা থাক্, অস্বীকার করিবার যো নাই যে একেবারেই। কিন্তু তাই বলিয়া নিজে হইতে স্বামীর কাছে ও-প্রসঙ্গটা তুলিবার দরকারই বা কি? যে ব্যাপারে নিজের গলদ, সেটাকে পাশ-কাটাইয়া যাওয়াই বরং সব দিক্ দিয়া ভালো। সুতরাং মালতী প্যাড্ হইতে লেখা কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্য একখানা কাগজে আগাগোড়া চিঠিখানি নূতন করিয়া লিখিয়া ফেলিল।

বউটি কয়দিন হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছে। সে-দিন গাড়ীটা যখন ওদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, মালতী তখন কুয়া-তলায় বসিয়া কাপড় কাচিতেছিল। ভিজা কাপড়েই ছুটিতে ছুটিতে

সে একেবারে উপরের ঘরে গিয়া জানালা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বৌটি কখন্ যে গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর উঠান পার হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিল, মালতী অনেক চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইল না।

নীচে হইতে মা বিরক্তিভরে বলিলেন,—মেয়ে দিন দিন যে কি রকম ধিঙ্গিই হচ্ছে! তারপর ধমকের সুরে ডাকিলেন—বলি হ্যাঁ রে, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছিস্, অসুখ করবে না?

নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে মালতী বলিল,—বাবা রে বাবা, তোমরা একটুকুতেই এমনি কর। পান থেকে চূণটুকু খস্‌লে আর রক্ষে নেই।

ঠাকুরমা বলিলেন,—তা, আমাদেরই যে দোষ হবে ভাই! অসুখ-বিসুখ করলে নাতজামাই ভাববে, আমরাই সব কুপথ্যি করিয়ে—

মালতী রাগ করিয়া বলিল,—হ্যাঁ গো, অসুখ অমনি করলেই হোলো আর কি!

কিন্তু বাকী যে কথাটা ঠাকুরমা বলিলেন, সেটা নিজের মনে মালতীরও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। যে রাগী এবং মুখফোড় মানুষ—তাহার পক্ষে সবই সম্ভব। তাহার রাগকে মালতীর বড় ভয়!

মাঝে মাঝে ও-বাড়ীর বৌটির গলার আওয়াজ শোনা যায়। কণ্ঠস্বর বেশ মিহি। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষটি একবারও চোখে পড়ে না! সময়ে সময়ে মালতী উপরের ঘরের জানালার ধারে তার উল্-বোনার সরঞ্জামগুলি লইয়া বসে, কিন্তু ও-বাড়ীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে গিয়া বোনার ঘর সব ওলট-পালট হইয়া যায়। আবার বোনার দিকে বেশী নজর দিতে গিয়া মনে হয়, বৌটা হয় তো এইমাত্র বাহিরে আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া

থাকিয়া তাহার মনে হয়, এমন করিয়া বসিয়া পাহারা দেওয়াটা হয়তো উচিত হইতেছে না। উহারা বুঝিতে পারিলে কি মনে করিবে ? তারপর সে আস্তে আস্তে জানালার কবাট প্রায় বন্ধ করিয়া, সামান্য একটু ফাঁক রাখিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু, আবার নিজের মনের কাছেই সে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। রাগও হয় ! কী এমন গরজ তার, এ ভাবে লুকাইয়া এই প্রতিবেশিনীটিকে দেখিবার ? তার রূপ আছে, বেশ তো ! সে রূপ লইয়া তার ঘরেরই শোভা বৃদ্ধি করুক, ইচ্ছা হয় রূপের গর্ব করুক ; তার জন্য মালতীর মাথাব্যথা করিবার কি প্রয়োজন ? কেন তার এই ব্যাকুলতা ?

কিন্তু সংসারে সব 'কেন'র উত্তর খুঁজিয়া-পাওয়া দুষ্কর। মালতী আবার বৌটিকে দেখিবার জন্য উস্‌খুস্‌ করে, এবং দেখা না-পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজের উপর বিরক্ত হয় ও রাগ করে।

সাম্‌নেই তাদেরই বাড়ীর সামিল খানিকটা পতিত জমি। সেখানে দুই চারিটা বাজে গাছ। ঝাঁকড়া আমগাছটা এবার মুকুলে ছাইয়া গিয়াছে। তারই সুমিষ্ট গন্ধ পড়ন্ত-বেলার ঠাণ্ডা বাতাসে মিশিয়া চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গোটা শিমুল গাছটা ফুলে-ফুলে একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কাদের একটা চাকর ফুট্‌ফুটে একটি ছোট ছেলেকে কোলে লইয়া মাটি হইতে একটা ফুল কুড়াইয়া খোকার মুখের কাছে ধরিয়া খেলা দিতেছিল। দিব্যি ফুট্‌ফুটে, গোলগাল ছেলেটি। কাদের ছেলে কে জানে !

মালতী চাকরটাকে ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বাড়ীতে সে কাজ করে ?

ও ! মালতী যা ভাবিয়াছিল, তাই ! পাশের বাড়ীর বৌটিরই ঐ ছেলে। সত্যিই ভারী সুন্দর। না হইবেই বা কেন ? ওদের সবারই যখন অমন রূপ !

এই খোকার মতই হয়তো ওর মায়ের মুখ আর গায়ের রঙ। সুতরাং অহঙ্কার একটু কেনই বা তার না হইবে?

ইচ্ছা হইলেও কিন্তু মালতী চাকরটাকে ডাকিয়া খোকাকে কোলে লইতে পারিল না। বৌটা যদি জানিতে পারে, হয় তো ভাবিবে··· কত কি হয়তো ভাবিতে পারে। কি দরকার পরের ছেলে কোলে করিবার?

অকারণেই যেন মনের কোন্‌খানে খানিকটা ব্যথা জমিয়া ওঠে। তাহারও তো একটি খোকা হইতে পারিত, কিন্তু হইল না। আর— তাহার ছেলে হইলে সে হয়তো তাহার মতই কালো হইত। সেই কালো ছেলেকে কেমন কয়িয়া সে পাঁচজনের সাম্‌নে বাহির করিত? বিশেষতঃ, ও-বাড়ীর বৌটীর ছেলের কাছে তাহার কালো ছেলেকে সে কেমন করিয়া দাঁড় করাইত? নাঃ, ছেলে না হইয়াছে সব দিক্ দিয়া ভালোই হইয়াছে। যে কালো, সংসারের পথ তাহার পক্ষে বড়ই দুর্গম!

নানা রকমের এলোমেলো চিন্তা মালতীকে পীড়ন করিতে থাকে। এমনও মনে হয়, এ-রকম যদি কোন ওষুধ বা মন্ত্র থাকিত, যাহার সাহায্যে কালো মানুষ ফর্সা হইতে পারে, তাহা হইলে মালতী একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। আর, এই সুসংবাদ পাইলে স্বামী তার নিশ্চয়ই পরম আগ্রহে তাহার সমর্থন করিত। পুরুষ মানুষ মুখে যাহাই বলুক, ফর্সা রঙের বিশেষ পক্ষপাতী। না হইবেই বা কেন? নিতান্ত নিরুপায় না হইলে সে কখনো কালোকে সহ্য করিতে পারে না। সত্যই, মালতী সে-জন্য স্বামীকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেম্‌নি তাহার প্রতি করুণাও তার কম নয়!

পরের দিন স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিয়া মালতী লিখিতে লাগিল,—

"কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমি মরে' গেছি। তুমি

আমার জন্যে খুব কাঁদছো। তারপর কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ। ভুলে গিয়েই আবার বিয়ে ক'রে এনেছ একটি টুক্‌টুকে সুন্দরী মেয়েকে। তার পর তোমার একটি খোকা হ'য়েছে—ফুটফুটে অতি সুশ্রী একটি ছেলে।....”

চিঠি পড়িয়া তার নিজেরই ভারী মজা লাগিল। স্বপ্ন না-হয় সে সত্যই দেখে নাই; কিন্তু কি আশ্চর্যভাবে তার মনের কথাগুলি সে চিঠিতে লিখিয়া ফেলিয়াছে! চিঠি পড়িয়া স্বামী হয়তো রাগ করিবে। করুক! তাহাকে রাগাইয়া মালতী খুব আমোদ পায়।

হঠাৎ সেদিন দেখা গেল ও-বাড়ীর সেই বৌটিকে। ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া নয়; অত্যন্ত সহজ ভাবে অল্পক্ষণের জন্য দেখা। উপরের ঘরের বিছানা পাতিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিতে গিয়া অন্যমনস্কভাবে ও-বাড়ীর উঠানে চোখ পড়িয়া গেল। বৌটি তখন একখানা শুক্‌নো কাপড় কুচাইয়া তুলিতেছিল। মুখখানি তার অতি অল্পই নজরে পড়িল। রঙ ফর্সাই তো, বেশ ফর্সা। তার উপর আবার পরণে কী সুন্দর একখানি সাড়ী! সাড়ীর যেমন রঙ, তেমনি জ্বল্‌জ্বলে পাড়। এত সুন্দর সাড়ী মালতীর একখানিও আছে কি? বোধ হয় নাই।

মাকে সে বলিল, ও-বাড়ীর বৌটি এম্‌নি সুন্দর একখানি সাড়ী পরেছে আজ দেখলুম। তেমন-ধারা সাড়ী কোনোদিন আমাকে দাও তোমরা! এদিকে বলো—এতো দাম, ততো দাম; অথচ সেই সব দামী কাপড়ের ছিরি দেখে অঙ্গ হিম হয়ে যায় আর কি!

মা হাসিয়া বলিলেন,—কি জানি বাপু, আমরা কি ছাই অত-শত দেখতে পাই? এতো বলি, ভালো কাপড় আন্‌তে! এবার সুবোধ এলে তাকেই আমি টাকা দোব, তুই বাছা তোর পছন্দমত সাড়ী আনিয়ে নিস্‌।

—ছাই, সে-ই যেন এনে দেবে। যেমন বাবার পছন্দ, তেমনি ওর! বৌটার সঙ্গে ভাব হ'লে ওকে দিয়েই আনিয়ে নিতুম। তা বাবাঃ, ওর যা গিদের!···তা হবে না কেন বল মা? যে রকম ভাল ভাল কাপড়-জামা পরে, নিশ্চয় অনেক টাকা ওদের। ছেলের জন্যে একটা চাকরও রেখেছে।

মা বলেন,—তা হবে। ওরা সহুরে মেয়ে! টাকা-কড়ি বেশ আছে বৈ কি! আমাদের মত তো ধান, আলু, আর গুড়—এই সব নেড়ে-চেড়ে ওদের খেতে হয় না?

বৌটির সম্বন্ধে মালতীর শ্রদ্ধা দিন দিন বেশ বাড়িয়া ওঠে। কিন্তু সে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা দূরে থাক্, ক্রমশঃই যেন তফাতে সরাইয়া দেয়। ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, 'আবার হারমণি বাজিয়ে গান গায়।' অনেক দিন পরে সেদিন তাহাও শোনা গেল।

বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদ নবমীতে পৌঁছিয়াছে। ওদের বাড়ীর সদর দরজার পাশেই একটা হাস্না-হেনার ঝোপ, সেখান হইতে একটা ঘন সুগন্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নার সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গেছে, যেন জ্যোৎস্না আর সুগন্ধকে তফাৎ করিবার একেবারেই যো নাই। সেই সুরভিত জ্যোৎস্নাকে ঝঙ্কারিত করিয়া শোনা গেল তার গান—

"ফাগুন্ যেদিন আস্তো দখিণ বায়ে,
সেদিন কিশলয়ের মেলায়,
কতই খেলা কিশোর-বেলায়
ছিল কোয়েল-ডাকা পিয়াল-বনছায়ে।"

মালতী একেবারে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। কি সুন্দর মিষ্ট গলা! গানের উপর মালতীর ভারী ঝোঁক। গুন্ গুন্ করিয়া সে দুই একটা গানের কলি গাহিতেও পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বৌটা যেন সকল দিক্ দিয়াই—সত্যই যাহাকে বলে, 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!' আর, তার নিজের না আছে রূপ, না আছে গুণ! পাড়াগাঁয়েই বিবাহ

হইয়াছে। স্বামী লেখা-পড়া জানেন ভালই; কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শুনা করেন গ্রামে বসিয়াই। নিজে গান শুনিতে ভালবাসেন। কিন্তু বৌকে গান শিখাইবেন, এ ইচ্ছা বোধ হয় স্বপ্নেও কোন দিন তাঁর মনে স্থান পায় নাই।

মালতী মনে মনে ভাবিল, জীবনটা শুধু ওদের জন্যই, অর্থাৎ যাহারা দু-মুঠা ভরিয়া পাইয়াছে এ জীবনে যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষার। কিন্তু মালতীর মত মেয়ের কী যে সার্থকতা বাঁচিয়া থাকিবার।

বৌটি গাহিতেছিল,—

"পলাশ লাজে হাস্‌তো পাশে,
কাঁপ্‌তো বেণু বঁধুর ত্রাসে,
হরষ ভয়ে ঝর্‌তো শিরীষ
ত্রস্ত দুটি পায়ে।"

তন্ময়তার মাঝখান দিয়া মালতীর চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে একটা চিত্র। তাদের গ্রামের বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটিতে এমনি জ্যোৎস্নার বন্যা বহিত। এমন দিনে সাম্‌নের কৃষ্ণচূড়া গাছটা ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। তাহারই নীচে দিয়া একটি সরু পায়ে-চলা পথ ঘাসের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেছে একেবারে সেই বাঁধা-ঘাট পর্যন্ত। ঘাটের দুই পাশে দুটি কামিনী ফুলের গাছ। কখনো সেই কামিনীর, কখনো কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পিত পল্লব ছিঁড়িয়া তার স্বামী তার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে আসিত। মালতী বলিত, আমি নাকি সাঁওতালনি গো, যে মাথায় ঐ সব গুঁজ্‌তে যাবো?—সে ছুটিয়া পলাইত, এবং শেষ পর্যন্ত ধরা-পড়িয়া স্বামীর বাহুবন্ধনের মাঝখানে হাঁপাইয়া এলাইয়া পড়িত। বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাইত, এমনি কত রাত্রি চলিয়াছে তাদের জীবনের বসন্ত উৎসব। দু'জনে বাঁধা-ঘাটে বসিয়া আকাশব্যাপী নীলাভ শুভ্র জ্যোৎস্নার বিপুল রজত-প্লাবনের পানে চাহিয়া থাকিত।

স্বামী বলিত,—এই রকম জ্যোৎস্নার মাঝখানে বসে' আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়—এ ঠিক যেন কোন্ মায়াপুরীর রাজকন্যা—ঘুমিয়ে আছে কার রূপোর কাঠির মৃত্যুস্পর্শে।

মালতী হাসিয়া বলিত,—আর তুমি যেন সেই রাজপুত্তুর, যে তার ঘুম ভাঙাবে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে।

……গানের সুরটা যেন কেমন জড়াইয়া-জড়াইয়া কাণে আসিয়া লাগিতেছে। মালতীর দু'টি চোখের পাতা যেন তন্দ্রায় ভারী হইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, যে গান গাহিতেছে, সে সেই মায়াপুরীর রাজকন্যা ছাড়া আর কেউ নয়!

মালতীর পক্ষে কিন্তু ইহা একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মনে-মনে সে তাই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, নিজেই যাচিয়া-গিয়া এক দিন বৌটির সঙ্গে আলাপ করিবে, তাতে অপমান যা-ই কিছু তার হোক্ না কেন!

মাকে বলিল,—বৌটা তো কৈ এলো না একবারও আমাদের বাড়ীতে?

মা বলিলেন,—ও মা গো! ওরা বড়লোকের মেয়ে, আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে কেন? তোর যে আর ঘুম হচ্ছে না ঐ ভেবে!

—সত্যিই ঘুম হচ্ছে না। তোমাদের যেমন, সারা সহরে বাড়ী করবার আর জায়গা পেলে না! এমন একজন নেই যে, দু'দণ্ড বসে' গল্প করি। সহরে বাড়ী কর্‌লে, তা বাপু এমন জায়গায় করো, যেখানে পাঁচজন মানুষ বাস করে।

মা হাসিয়া বলিলেন, এখানটা যে একেবারে বন ছিল রে, এই সবে নতুন বাড়ী হচ্ছে। পাঁচ বছর বাদে দেখ্‌বি, চারধারে লোক গিস্‌-গিস্ করচে!

—হ্যাঁ গো! এখন যে কি করে' দিন কাটে তার ঠিক নেই, তা আবার পাঁচ বচ্ছর পরে! তার চেয়ে যা মনে করে করুক্ গে, আমি চল্‌লুম ওদের বাড়ীতে। আলাপ কর্‌বো তার আবার কি? বাঘ তো নয়, যে খেয়ে ফেল্‌বে।

মালতী উপরে আসিয়া একখানা ভাল জরিপাড় সাড়ী ও একটা রঙীন সিল্কের ব্লাউজ পরিল। আয়নাতে মুখখানি ভাল করিয়া ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া দেখিয়া খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাক্স হইতে পাউডার ও স্নো বাহির করিল।

সত্যই, মুখের রঙটা অনেকখানি ফিকে দেখাইতেছে বৈ কি! মনে মনে খুশী হইয়া একটু হাসিল।

সিঁড়িতে নামিতে গিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা। মা বলিলেন,—ও-মা, যা ভেবেছি, ঠিক তাই! এম্‌নি ভূতের মতো ন্যাড়া হ'য়ে যায় বুঝি? গয়নাগাঁটিগুলো বুঝি বাক্সয় ভরে' রাখ্‌বার জন্যেই তৈরী হয়েছে? চল্, দেখি। —বলিয়া তিনি মেয়ের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন আবার ঘরের ভিতর।···

মিনিট দশেক পরে মালতী ও-বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া শিকল নাড়িল। শিকল ঝন্-ঝন্ করিল; সঙ্গে সঙ্গে দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠিল মালতীর বুকের ভিতরটায়। অথচ, কেন যে, তাহার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না।

বৌটি দরজা খুলিয়া-দিয়াই প্রথমটা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তার পর রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল,—আসুন, আসুন! আপনি এসেছেন? আমি ভাবলুম বুঝি—

মালতী বলিল,—ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি? আমি এসে ঘুম ভাঙিয়ে

বৌটি হাসিয়া বলিল,—ঘুমুবার জ্বালা! এই তো এতক্ষণে দস্যি ছেলেটা ঘুমুলো।

মালতী লক্ষ্য করিল, একখানি পেঁয়াজী-রঙের ফুলতোলা ছাপা সাড়ী তার পরণে। গায়ে ঐ রঙেরই একটি ব্লাউজ আছে বটে, কিন্তু কাপড়খানা এমন করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়াছে যে ব্লাউজের খুব সামান্যই নজরে পড়ে মাত্র।

তক্তপোষের উপর একখানি সিঙ্গাপুরী মাছুর পাতা, তাহারই উপর দু'জনে বসিল। মালতী এক-একবার তার মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরাইয়া লইয়া যা-হোক্ একটা কথা পাড়ে। বৌটি সে প্রসঙ্গের খুব অল্পই জবাব দেয়, কোন রকমে দুই চারিটা কথা বলিয়া যেন কর্তব্য শেষ করে। প্রাণ খুলিয়া সে যে মালতীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেছে না, এটুকু মালতী বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। থাকিয়া-থাকিয়া সে যেন একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। যেন এমনিভাবে দু'জনে বসিয়া গল্প করিবার অন্তরালে কোথায় তার রীতিমত একটা অসুবিধা রহিয়াছে, অথচ সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবারও নহে।

মালতী একবার বলিয়া ফেলিল,—তোমায় কিন্তু ভারী অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি এসে হয়তো অসুবিধে কর্‌লুম তোমার—

—না না, ও কি বল্‌ছেন আপনি! আমার আবার অসুবিধে কি?

মালতী বলিল,—কিন্তু বেলাও তো শেষ এলো! এখনো হয়তো অনেক কাজই বাকী পড়ে আছে?

—কাজ? তা, কাজ তো এখনো সবই বাকী ভাই! কাজের কি শেষ আছে?—বলিয়া সে একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল। পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি বলিল,—তা, কাজ রোজই আছে, কিন্তু রোজই তো আপনাকে পাবো না!

—তা পাবে না, যতদিন না আমাদের বাড়ীতে তুমি একদিন যাচ্ছ। কবে যাবে বল।

—কবে যাবো? যাবো বৈ কি! যে-কোনোদিন গেলেই তো হোল। এত কাছে যখন বাড়ী—

—হ্যাঁ, যেও। তুমি গেলে তবে কিন্তু আমি আবার আস্‌বো। এই বলে রাখ্‌ছি।

সেদিন মালতী বাড়ী ফিরিল মনের ভিতর অনেকখানি খুসী লইয়া। বৌটি শীঘ্রই আসিবে বলিয়াছে। মালতীর পক্ষে সে একটা শুভদিন।

মালতী কথায়-কথায় তার নামটিও জানিয়া লইয়াছে। চমৎকার নাম, চিত্রা! যে ভালো, তার সবই ভালো। আর, তার নিজের নামটাও কি ভালো হইতে নাই? বাগ্দীদের যে বুড়ীটা তার শ্বশুরবাড়ীতে ধান ভানিতে আসে, তাহার নামও মালতী। কী বিশ্রী নাম!

হ্যাঁ, চিত্রা সত্যই সুন্দরী। কিন্তু নিতান্ত যেন গোবেচারা-গোছের। কলিকাতার মেয়ে বলিয়া যেন মনেই হয় না। তাহার এমনি ভয় হইয়াছিল, না-জানি কত না লম্বা লম্বা কথা বলিবে; মালতীকে হয় তো থ হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু কথা বরং মালতীই বেশী বলিয়াছে। ও যেন বড় বেশী জড়সড়। গায়ের কাপড়টুকু কেমন যেন একটু বিশেষ সাবধানে দেহের চারিদিকে টানিয়া দিয়া বসিয়াছিল। কেন, কে জানে! একটা কথা মালতীর মনে হইল। হয়তো তাহাই।

মালতী নিজের মনে মনে না হাসিয়া পারে না। ওর খোকা এই সবে মাস-ছয়ের হইয়াছে।···তা, এমন তো কত জনেরই হয়। তার মেজ-জায়েরও তো ঠিক এমনিই। এতে আর অত লজ্জা করিবার কি আছে? পাগল আর কাহাকে বলে! দাঁড়াও না, এবার দেখা হইলে মালতী এম্‌নি মজা করিবে।

রোজই মালতী মনে করে, আজ সে আসিবে, এবং তার উপরের ঘরখানিতে তার জন্য বেশ একটু গোছগাছ করে। একখানা ভাল সাড়ী পরিয়া সারা দুপুরটা ওর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। কিন্তু বেলা পড়িয়া যায়, সে আর আসে না। এক-একবার উপরের ঘরের জানালায় গিয়া দাঁড়ায়, ও-বাড়ীর দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; কিন্তু কাহারও দেখা মেলে না। মালতী বিরক্ত হইয়া সরিয়া যায়।

নাঃ, বৌটা রীতিমত গর্বিতাই। অহঙ্কার ছাড়া এ আর কিছুই নয়। একটা সাধারণ ভদ্রতাও কি নাই? অথচ, মুখে বলে সহরের মেয়ে! এর চেয়ে পাড়াগাঁই তো হাজার গুণে ভালো!

কয় দিন হইল, মালতী ও-বাড়ীর দিকের জানালাগুলো পর্যন্ত একবারও খোলে নাই, পাছে ও-বাড়ীর দিকে তাকাইতে গিয়া বৌটার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া যায়। ও-দিকে যে একটা বাড়ী আছে, এবং কোন লোক বাস করে, সেটুকু পর্যন্ত ভুলিবার চেষ্টায় সে যেন একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে!

অনেক দিন হইয়া গেল, স্বামীর চিঠির কোন জবাব দেওয়া হয় নাই। রাত্রে সে লিখিতে বসিল। অন্যান্য কথার পর লিখিল,—

"এখানে আর আমার একদম্ ভাল লাগে না। বাবা যে কেন সখ্ ক'রে গ্রামের বাড়ীর ছেড়ে এখানে বাড়ী কর্‌তে এলেন, আমি তো একেবারেই বুঝ্‌তে পারিনে। তোমাকে মাঝে মাঝে সহরে যাবার কথা বলি, কিন্তু সে সখ মিটেছে আমার। সহরে কোনো সুখ নেই। তার চেয়ে ওখানে আমাদের ঢের ভালো। হালদার-বাড়ীর গঙ্গাজল বোধ হয় এত দিনে ফিরে এসেছে? বৈঠকখানা-বাড়ীর বাতাবীলেবুর গাছটাতে খুব ফুল ধরেছে তো? লিচু গাছটাতে এবার কি রকম লিচু এসেছে লিখ্‌তে ভুলো না।

সত্যি লিখো। তুমি হয়তো হাস্‌বে, কিন্তু সত্যিই আমার সেখানকার জন্যে মন কেমন করছে।"

স্ত্রীর এ-চিঠির সুবোধ আর কোন উত্তর দিল না। ঠিক করিল, সশরীরে সেখানে আবির্ভূত হইয়া একেবারে সোরগোল তুলিয়া দিবে।

তাহার শ্বশুরের গ্রামের বাড়ীতে সে কয়েকবার গিয়াছে, কিন্তু সহরের এই নূতন বাড়ীতে আজ পর্যন্ত যায় নাই। বাড়ীটা নাকি সহরের এক প্রান্তে, সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা। আগে হইতে একটা খবর দিলে অবশ্য মন্দ হইত না, কিন্তু তাহাতে মালতীর খুসী অনেকখানি কম হইয়া পড়িবে যেন। এসব ব্যাপারে আকস্মিকতার অনেকখানি মূল্য আছে বৈ কি!

পথে আসিতে আসিতে মালতীর শেষ চিঠিখানির কথাই সুবোধ ভাবিতেছিল। মালতীর বহুদিনের সাধ সহরে আসিয়া বাস করিবার। সুবোধ ভাবিতেছিল, সহরে বাপের বাড়ীতে গিয়া সে সাধ আরও বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু হঠাৎ এমন আশ্চর্যভাবে সে-সখ মিটিয়া গেল কি করিয়া, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না!

অধুনা-অভ্যস্ত তাহাদের গ্রাম্য নীড়খানির বাহিরে কর্মচঞ্চল পৃথিবীব পানে চাহিয়া সুবোধের আজ মনে হইতেছে, নিজেও সে যেন অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। সে-ই যে একদিন কলিকাতার হোষ্টেলে থাকিয়া দেশ-বিদেশের ছাত্রদের সঙ্গে হুল্লোড় করিয়া দিন কাটাইয়াছিল, সেকথা যেন সে আজ নিজেকেই বিশ্বাস করাইতে পারে না। আজ যখন তার সেই সব অন্তরঙ্গ সহপাঠীদের কথাই একে একে মনে পড়িতেছিল, সেই সময় সহসা তাহাদেরই একজনের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ অণ্ডাল্ ষ্টেশনের চায়ের ষ্টলে।

—আরে কে, সুবোধ না ?

পাশের আগন্তুকটির দিকে চাহিয়াই সুবোধ অবাক। একমুখ হাসিয়া বলিল,—কে হে, অশেষ যে ? আশ্চর্য ! এই মাত্র আমি ঠিক তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। সেই অশেষ গুপ্ত, প্রবীর চাটুয্যে, কিরণ সরকার ইত্যাদি হোষ্টেলের নামজাদা ষ্টলওয়ার্ট—

চেয়ার টানিয়া বসিয়া-পড়িয়া অশেষ বলিল,—তারপর, খবর কি ? কোথায় যাচ্ছ ?

সুবোধ বলিল,—একবার বর্ধমান যাবো।

—তুমি বর্ধমান যাচ্ছ ? আর আমি বর্ধমান থেকেই আস্‌ছি, যাবে। আসানসোল। ঐ যে ট্রেণটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দশ মিনিট এখানে ষ্টপেজ। বড্ড চায়ের তেষ্টা লাগলো, তাই এক কাপ— দাও হে এক কাপ তাড়াতাড়ি ! চায়ের জন্যে ট্রেণ ফেল করতে পারবো না কিন্তু ! তারপর ? তোমার ডাউন ট্রেণের তো এখনো প্রায় তিন কোয়াটার দেরী।

—হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। উঃ, তোমার সঙ্গে কতদিন পরে যে দেখা ! তাই ভাবি, দেখা না হওয়াটাও যেমন আশ্চর্য, হওয়াটাও তো তেম্‌নি। প্রবীর কি করছে হে ? সে নাকি একটা কি বড় গোছের—

—হ্যাঁ, মুন্সেফী পেয়েছে। কিরণ শুনলুম লোহার কারবারে মোটা লাভ করেছে। আর আমি কি করছি শুধোলে না যে ?

—সত্যিই তো, কি কর্‌চো বল না ?

—আমি ? দস্তুর মতো বাঙ্গালীর ট্রাডিশনটা বজায় রেখেছি হে, বুঝলে ? অর্থাৎ, কেরাণীগিরি কর্‌ছি, রাজভাষায় যাকে বলে, গবর্ণমেন্ট সার্ভেন্ট।

—তা, মন্দ কি ? যে বাজার ! কত লোক যে ঐ চাকরীর জন্যেই ত্রিভুবন চষে' বেড়াচ্ছে !···কোথায় আছ ? আসানসোলে বুঝি ?

—না হে, বর্ধমানে। হ্যাঁ, তুমিও তো বর্ধমানে যাচ্ছো বল্‌লে না? যে রকম রাজবেশ, শ্বশুরবাড়ী নয় তো?

সুবোধ হাসিল।

—আরে, বল কি? সত্যিই শ্বশুরবাড়ী? বর্ধমানে? কি আশ্চর্য!

হঠাৎ ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল। অশেষ বলিল,—আচ্ছা গুড্‌বাই। বর্ধমানে পারি তো খুঁজে বার কর্‌বো তোমায়।

ছুটিতে-ছুটিতে গিয়া সে ট্রেণে উঠিল। ট্রেণ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাহিনী শুনিয়া সুবোধ স্ত্রীকে বলিল,—ওঃ! এরই জন্যে বলা হচ্ছিল, বৌটার ভারী দেমাক্‌! আসলে বল, সুন্দরীর কাছে তোমার এগোবার সাহস নেই!

মালতী ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল,—ঈস্‌, তা আর বল্‌তে হয় না। জানো, আমি গিয়েছিলুম দেখা কর্‌তে! তা এমনি অসভ্য, আস্‌বো বলে' এক দিনও এলো না। ছি ছি, এমন পড়্‌শি নিয়ে আবার মানুষে বাস কর্‌তে পারে? আমার এম্‌নি মন খারাপ হ'য়েছিল, কি বল্‌বো! ভাগ্যে তুমি আজ এলে!

—কি আশ্চর্য! আমি আসাতে অসভ্য বৌটার ওপর রাগ পড়ে' গেল বুঝি?

—তা কেন যাবে, বা-রে! দিন দিন কি রকম হ'য়ে যাচ্ছ তুমি! সত্যি, আমার এমনি রাগ হয়েছে, ও যদি কোনোদিন আসেও, তাহ'লে আর আমি কথা পর্যন্ত কইবো না।

—পার্‌বে না। বাজী রইলো পাঁচ টাকা।

—আমার টাকা অত সস্তা নয়।

—বোঝা গেল। কিন্তু, তুমি তো আচ্ছা পাগল! কে একটা অজানা মেয়ে, কোনোদিন জানাশোনা নেই, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন বল তো? দু'দিন পরে যখন এখান থেকে চলে' যাবে—

—তাই বলে' ও আমায় এম্‌নি করে' অপমান করবে কেন? আমি নিজে গেলুম মায়ের বারণ ঠেলে, আর ও কি না—ঈস্, ভারী তো আমার রূপসী গো!

—তুমি যে পাগল, তাতে আর আমার কোনো সন্দেহ নেই।

পরের দিন বৈকালে সুবোধ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। কিন্তু তার অনেক আগেই সে ফিরিয়া আসিল।

মালতীকে ডাকিয়া বলিল,—চট্ করে' তৈরী হ'য়ে নাও দেখি! এক জায়গায় বেড়াতে যাবো।

মালতী হাসিয়া বলিল,—কোথায় গো? সিনেমায় বুঝি?

—না। পাশের বাড়ীর বৌটির সঙ্গে দেখা করতে। তুমি এবং আমি, দু'জনেই এক সঙ্গে।

মালতী ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করিয়া মুহূর্তমাত্র চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—কী-যে ঢঙ্ কর, গা জ্বলে' যায়!

বলিয়া সে নীচে নামিয়া যাইতেছিল, সুবোধ তাহার আঁচলটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—সত্যি বল্‌ছি, তৈরী হ'য়ে নাও। তুমি না গেলে আমাকে একাই যেতে হবে। সেটা বেশ সুবিধের হবে ব'লে মনে হয় না।

মালতী রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। কিন্তু, সে সেই ধরণের মেয়ে, যাদের আগুন হইতে যত সময় লাগে, জুড়াইয়া জল হইতে লাগে তার চেয়ে অনেক কম সময়।

সুতরাং তাহারই মিনিট পাঁচেক পরে মালতীকে উপরের ঘরে গিয়া দ্রুত অথচ অত্যন্ত সতর্ক প্রসাধন সারিতে দেখা গেল।

—ওগো, শুন্‌ছো ?

চিত্রা ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইতেই তার স্বামী বলিল,—দিদি চিঠি দিয়েছেন। তোমাদের একদিনও তাঁর ওখানে নিয়ে যাইনি বলে' বিষম চটেছেন। খোকাকে—

—বেশ তো, তুমি যাও খোকাকে নিয়ে।

—শুধুই খোকাকে ? কি মুস্কিল ! দিদি হয় তো কেঁদেই আকুল হবেন, মা-মরা ছেলেটাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে এসেছি ভেবে।

—তা, আমি কি করবো ?

—তবু তুমি যাবে না ?

—না।

—বেশ, যেও না। লোকে ভাববে, তোমার রূপের গরম এত বেশী যে—

—ভাবুক। বলিয়া চিত্রা মুখখানা ভারী করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। হঠাৎ অকারণেই তাহার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, অনির্দিষ্টকালের জন্য এইখানে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া খোকাকে লইয়া পড়িয়া থাকে। সংসারের ভারী চাকাটাকে ঘুরাইবার মত ক্ষমতা তাহার একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

হ্যাঁ, রূপ তাহার আছে ; সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু, না থাকিলেই বা কি ক্ষতি হইত ? ঐ তো পাশের বাড়ীর ঐ মেয়েটি, রঙ তার কালো, কিন্তু কি স্বচ্ছন্দধারায় চলিয়াছে তার জীবনের নির্ঝরিণী ! পূর্ণতার আতিশয্যে সে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে ! যদি সে ঐ মালতীর মত হইতে পারিত—

স্বামী তার এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ! সে যেন মানুষের তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক উপরে। কিন্তু এ-ধরণের মানুষ সংসারী হয় কেন, চিত্রা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার উপর চিত্রা রাগ করে, কিন্তু তার মুখের পানে চাহিলেই ভোরের কুয়াশার মত সে রাগ আপনা-আপনি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়।

তাহার বেদনা বুঝিবার মত এ-সংসারে কেহ নাই। এমন কি, তাহার স্বামীও নয়। তাই, এই বিশাল পৃথিবীর মাঝখানে সে নিজেকে অনুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিতে চায় তার নিজেরই কুণ্ঠার আড়ালে।

দরজা ঠেলিয়া তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিল।

—ওগো, আর-একটু চা দেবে না? তাড়াতাড়ি একবার বেরুতে হবে যে! বহুদিনের পুরোনো এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আজ খুঁজ্‌তে বেরুব। শুন্‌লুম, সে তার শ্বশুরবাড়ীতে এসেছে, এই বর্ধমানেই। খুঁজে পেলে ধরে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে দোব। আনন্দ পাবে আলাপ ক'রে।

চিত্রা বলিল,—আমার কারু সঙ্গে আলাপ করিবার সখ নেই।

—কিন্তু সত্যিই যদি আসে? তুমি তার সাম্‌নে বেরুবে না বুঝি? ও-সব দুষ্টুমী চল্‌বে না, তা ব'লে রাখ্‌ছি। তাহ'লে কিন্তু ভয়ানক কাণ্ড হবে।

চিত্রা কোন কিছু বলিবার পূর্বেই বৈঠকখানার দরজায় ঘন ঘন করাঘাত শোনা গেল।

চিত্রা চকিত হইয়া বলিল,—কে এসেছে গো!

তার স্বামী গম্ভীরভাবে বলিল,—তুমিই দেখ না কে!

—আমি? কি-যে বল!

—দোষ কি? তবু বাইরের একটা লোকের মুখ চোখে পড়তো! —বলিতে-বলিতে সে বাহিরে আসিয়া দরজা খুলিয়াই অবাক্‌ হইয়া গেল।

সুবোধ বলিল—একা নই কিন্তু, বৌকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

অশেষ একেবারে ব্যস্ত হইয়া বলিল,—এসো ভাই, এসো, এসো।···ওগো, কোথায় গেলে? ওকি, বৌদি' যে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ্‌চাপ?

সুবোধ বলিল,—থাক্, ব্যস্ত হ'তে হবে না। ওঁদের পরিচয় আগেই হ'য়ে গেছে। তোমরা যে একেবারে এই পাশের বাড়ীতেই তোমাদের কুলায় রচনা করে' বসে' আছ, তা কে জান্‌তো?

চিত্রা ততক্ষণে দরজার আড়ালে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। মালতী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল। মালতী নীচু-গলায় বলিল,—আজ কিন্তু ভাব কর্‌তে আসিনি। ঝগ্‌ড়া করতে এসেছি।

চিত্রা তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া ভিতরের ঘরে বসাইল। মালতী কি বলিতে যাইতেছিল, দরজার দিকে নজর পড়িতেই মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিল। অশেষ ও সুবোধ ঘরের ভিতর ঢুকিল।

অশেষ বলিল,—উঁহু, ও-সব ঘোমটা-টোমটা কারু দিলে চল্‌বে না, তা বলে' রাখ্‌ছি। কি আশ্চর্য! একেবারে পাশাপাশি বাড়ীতেই—

সুবোধ বলিল,—মালতী কিন্তু বেজায় চটেছে বৌদি'র ওপর। বৌদি নাকি ওকে রিটার্ণ ভিজিট পর্যন্ত দেন্-নি।

অশেষ একবার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল,—আরে ভাই, সে-কথা আর বল কেন? ও এক অদ্ভুত মানুষ! যাকে বলে একটি আস্ত পাগল আর কি! সর্বদাই ভয়, কে কোথায় বাড়ীতে এলো। কারু বাড়ীতে যেতে হ'লে ওর চোখ দুটো আগেই কপালে ওঠে!···দেখ্‌চো না, কি রকম জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছে! ওর কাণ্ড দেখে আমায় কোন্ দিন না সত্যিই ক্ষেপে যেতে হয়, তাই ভাবি। এক একদিন এমনও মনে হয়েছে যে, ছুটে গিয়ে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রীতিমত থিয়েটারী সুরে চীৎকার ক'রে বলি,—

'ওগো, আমরা যা, তাই-ই। ঐশ্বর্য আমাদের নেই, এবং তার জন্যে কোনো কুণ্ঠাও আমাদের নেই।' তবে যদি ওর মনের ধোঁকা কাটে। —বলিয়া অশেষ হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

সুবোধ অবাক্ হইয়া গেল বন্ধুর কথায়, এবং তার কথা বলিবার অদ্ভুত ধরণে। মুহূর্তমাত্র হতবুদ্ধি হইয়া থাকিয়া সে-ও সশব্দে হাসিয়া

মালতীর চোখ দু'টি বুঝি তার নিজেরই অজ্ঞাতে চিত্রার অনাবৃত হাতখানির উপর গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের হাতের সোণার চুড়ির সেটটা যেন হঠাৎ অসহ্য রকমের ভারী হইয়া

দু'টি মেয়ে একই সঙ্গে চোখাচোখি চাহিয়া হাসিল। হাসিল বটে, কিন্তু লজ্জায় দুজনেরই মাথা মাটীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

পথ ও পথিক

রাস্তার ও-পারেই ঝক্‌ঝকে একখানা বাড়ী, সোজা মাথা খাড়া করিয়া তিনতলা পর্যন্ত উঠিয়াছে। কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটের ভিতর ঢুকিয়া যে অল্প একটু জায়গা আছে, তাহারই পাশে করগেটের ছাউনি-দেওয়া মোটর গ্যারেজ। বাড়ীর ভিতর গাছপালার সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে, অথচ নাম তার 'কুঞ্জবন'।

এ-পারের পেট্রোল ডিপোতে বসিয়া সমীর ঐ 'কুঞ্জবনে'র পানে চাহিয়া ভাবে, মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে তার মনের বুঝি এমনি করিয়াই কোন দিনই মিল হয় না। বাস্তবের প্রয়োজন যেখানে তাহাকে এই নিতান্ত নীরস ইট-কাঠ-সর্বস্ব তিনতলা বাড়ীর তাগিদ দিল, সেখানেও কিন্তু সে তার মনের অতি ক্ষীণ রসপিপাসাটুকুর অমর্যাদা করিতে পারিল না। ঐ বাড়ীটাকে 'কুঞ্জবন' কল্পনা করা যত কঠিন এবং অসম্ভব হোক্‌, তবু ঐ নামের ভিতর দিয়া উহার মালিকের অনেকটুকু পরিচয়ই পাওয়া যায়।

ঠিক এমনি গর্‌মিল সমীরের নিজের জীবনেও। আকাশ-চাওয়া মনের কল্পনা লইয়া শেষে কিনা তাহাকে এই মারোয়াড়ীর পেট্রোল-ডিপোতে ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকরী গ্রহণ করিতে হইল! কিন্তু কি করিবে? রসদ না থাকিলে রসের উৎস মরুময় হইয়া উঠিবে যে!

ছেলেবেলা হইতেই মন তার কত সম্ভব-অসম্ভব রাস্তা ধরিয়া কত আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত দেশে ছুটিয়া যাইত। কয়েক বৎসর পূর্বে একবার তার বাবা বাঁচিয়া থাকিতে সে বাড়ী হইতে পলাইয়া

গিয়াছিল—পকেটে মাত্র দশ আনা পয়সা সম্বল করিয়া। সেদিনের সেই পথ-চলার উন্মাদনা আজও মনে পড়ে। রেল লাইনের ধারে ধারে চলিতে চলিতে কত কথাই তার মনে জাগিয়াছিল সেদিন! এমনি করিয়া চলিতে চলিতে একদিন হয়তো সে প্রয়াগ পার হইয়া মথুরা বৃন্দাবনের ভিতর দিয়া একেবারে বোম্বাই পর্যন্ত পৌছিয়া যাইতে পারে। বোম্বাইয়ের কোল দিয়া সেই বিশাল সাগর, সেই বিরাট অ্যারেবিয়ান সী! তার মনে হইত, বিপুলা পৃথ্বীর এই পান্থশালায় সে তো শুধু একজন পথিক, শুধু চলাই যার কাজ, দূর হইতে আরো দূরে, আরো দূরে!

কিন্তু আজ বাবা নাই। বি-এ ফেল করিবার পর নানা জায়গায় চাকরী খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া শেষে এই পেট্রোল-ডিপোর চাকরীটা পাইয়া যেন সে হাতে চাঁদ পাইয়াছে।

তা, একদিক দিয়া এ মন্দও নয় কিছু। সুদূর-বিসর্পী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের একধারে এই ডিপো। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে নূতন ঘরখানি। ঘরের ভিতরকার চারিদিকের দেওয়ালে তাক্ সাজাইয়া মোটরের রকমারি সাজ-সরঞ্জাম। মাঝখানে বসিবার জন্য টেবল চেয়ার। একটি ছোট টি-পয়, একখানি ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ার এবং একপাশে একটি ক্যাম্প-খাট। রাত্রে এইখানেই তাহাকে থাকিতে হয়। সারারাত্র পেট্রোল-পাম্পের উপরকার আলোটা জ্বলে। ঐ ইজি-চেয়ারখানিকে বাহিরে আনিয়া তাহারই উপর শুইয়া শুইয়া সে অনেকরাত্রি পর্যন্ত কাটাইয়া দেয়। তারপর এক সময় ভিতরে আসিয়া ক্যাম্পখাটের উপর শুইয়া পড়ে।

নিতান্ত মন্দ লাগে না। বিশেষ করিয়া নির্জন রাত্রিগুলির এই একাকীত্ব। সহরের এক প্রান্ত দিয়া এই বিশাল রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। দুইধারে বড় বড় গাছ—অশ্বত্থ, শিরীষ, মেহগনি ইত্যাদি। রজনীর নিস্তব্ধতার নির্বাক সাক্ষীস্বরূপ বসিয়া বসিয়া নৈশ

প্রকৃতির কত বিচিত্র মূর্তিই না সে প্রত্যক্ষ করে। অন্ধকার রাত্রে আকাশের বুকে এলোমেলো ছড়ানো ঐ নক্ষত্রগুলি কেমন করিয়া পরস্পরের পানে মিটি মিটি চাহিয়া থাকে, কেমন করিয়া শুক্লা তৃতীয়ার ফালি চাঁদখানি পশ্চিমের ঐ বটগাছের মাথার উপর কখন উঠিয়া কখন ডুবিয়া যায় এবং সেই চাঁদ দিনের পর দিন বাড়িয়া ক্রমশঃ কেমন করিয়া পূর্ণিমার সৌন্দর্য-গরিমায় বিকশিত হইয়া ওঠে, এ-সকলের সাক্ষীই ঐ সমীর। ইহাদের দেখিতে দেখিতে সে ভুলিয়া যায় তাহার নিজের জীবন, এই পেট্রোল-ডিপো, পারিপার্শ্বিক সব কিছুই। তাহার মনের স্বভাবজ ভাবুকতা তাহাকে অনেক দূরে টানিয়া লইয়া যায়। কোন কোন দিন সে টি-পয়ের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতে বসে—পেট্রোল খরিদ-বিক্রয়ের হিসাব নয়, কবিতা বা ঐ ধরণের একটা কিছু। কিন্তু খানিকক্ষণ হিজিবিজি কাটিয়া কাগজটা কুণ্ডলী পাকাইয়া ফেলিয়া দেয়। তখন মনে হয়, ত্রিশ টাকা মাহিনার জন্য যাহাকে শেষে এই পেট্রোলডিপোতে চাকরী লইতে হইল, তাহার আবার কবিত্বের বালাই কেন? তখন মনে হয়, বাঙ্গালীর এই ভাব-প্রবণতাই বাঙ্গালীর যত বেশী ক্ষতি করিতেছে, তত আর কিছুতে নয়। তখন অন্তরে অন্তরে বিপ্লব বাধে, বাস্তবে আর কল্পনায়।

'কুঞ্জবনে'র বাবুটি আজ স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের লইয়া মোটরে করিয়া কোথায় গেলেন। সকালে তাহারই ডিপো হইতে পেট্রোল আর মবিল লইয়া গেল। সমীরের একবার ইচ্ছা হইল ড্রাইভারটাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাইবে বাবুরা। ড্রাইভারটাও যেন কথাটা বলিবার একটা সুযোগমাত্রের অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সমীর ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে সে সুযোগ দিল না। ঐ একটা নগণ্য মোটর

ড্রাইভারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করিতে যেন তার মর্যাদায় বাধিল! সে পাম্প হইতে গাড়ীতে পেট্রোল ভরিয়া দিল এবং মবিলের টিন বাহির করিয়া দিয়া টাকা লইয়া গম্ভীরভাবে টেবলের সামনে বসিল।

মানুষ ও মালপত্রে বোঝাই হইয়া মোটরখানা যখন তাহার চোখের উপর দিয়া পশ্চিমদিকে ছুটিয়া গেল, তখন আবার সমীরের মনে হইল, কতদূরে উহারা যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেই বেশ হইত। নিশ্চয় বহু দূরের যাত্রী! কে জানে, কতদূর! বহু দূর বিস্তৃত এই পথের বুক বাহিয়া তাহাদের মোটর ছুটিয়াছে তীরের মত বেগে। ফাঁকা রাস্তা, হয়তো ঘণ্টায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে! কী অপূর্ব এবং চমৎকার ওদের জীবন! পার্বত্য নির্ঝরের মত গতিশীল এবং বৈচিত্র্যময়! আর তাহার নিজের জীবনে না আছে কোন গতি, কোন বৈচিত্র্য। অথচ, ঐ গতির রসদ সংগ্রহ করিল ওরা তাহারই কাছে। তাহারই দেওয়া পেট্রোলে তাদের মোটর ছুটিয়াছে উর্দ্ধশ্বাসে, আর সে নিজে বসিয়া আছে স্থাণুর মত!

এক এক সময় মনে হয়, নাঃ, ছাড়িয়া দিবে এই জঘন্য কাজ। দাসত্বের এতবড় হীন অবস্থা বুঝি আর কিছুই নাই। ইহার চেয়ে অপর যা-হোক কিছু করাও অনেক ভালো। রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করিলেও—তবু তাতে এর চেয়ে অনেক কিছু স্বাধীনতা থাকে। দিন নাই, রাত নাই, এই পেট্রোল ডিপোতে বসিয়া বসিয়া রাস্তার ঐ অসংখ্য পথচারীদের পানে চাহিয়া থাকা সময়ে সময়ে তাহাকে যেন রীতিমত অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। ঐ মোটর-বিহারীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও পথের পাশের ঐ ঢালু মেঠো অংশটুকু দিয়া ঐ যে গাড়োয়ান গরুর গাড়ীটা লইয়া চলিয়াছে, উহার অবস্থাও তাহার চেয়ে অনেক ভালো যে! তাই বা কেন, ঐ যে একটা নিঃসঙ্গ লোক চলিয়াছে তার কাঁধের উপর শোয়ানো

ছাতার একান্তে তার বোচকাটিকে ঝুলাইয়া—দুই পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে, উহারও অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভালো। চারিদিকের চলমান এই পৃথিবীর মাঝখানে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকার মত মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর যে কি থাকিতে পারে সমীর কল্পনা করিতে পারে না।

আবার এক সময় মনে হয়, তাহার এই মন-গড়া দুঃখের সত্যকার কোন অস্তিত্বই নাই। খাওয়া খরচ বাদে মাসে এই যে ত্রিশটা টাকা, এর দাম জগতের সমস্ত কবিত্ব—সমস্ত ভাবুকতার বহু বহু উর্দ্ধে! টাকা থাকিলে সংসারে সব কিছুই যে সম্ভব, এ কথাটা অস্বীকার করিবে সে কেমন করিয়া? ঐ একটা বস্তুর জোরে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, সব জায়গাতেই উল্কাগতিতে ছুটিয়া যাওয়া চলে।

পাম্পের মাথার উপর কাচের ফানুসের গায়ে ঐ ছবিটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমীর আপনার মনে হাসে। কি দূরদর্শী সেই মার্কিণ বণিক, যে ঐ পেট্রোল পাম্পের উপর ঐ সুন্দর পক্ষিরাজ ঘোড়াটির পরিকল্পনা দিয়াছে! হ্যাঁ, ঐ পক্ষিরাজের দুর্দমনীয় গতি তুমিও পাইবে, কিন্তু চাই টাকা। আধুনিক জগতের পক্ষিরাজ ঘোড়া ঐ টাকা।

একখানা গাড়ী আসিয়া ডিপোর আঙ্গিনায় ঢুকিল। সমীর উঠিয়া পেট্রোল দিল ও দাম মিটাইয়া লইল। গাড়ীর ভিতর হইতে একটি আধাবয়সী লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, বলতে পারেন, বরাকর যেতে কি নদী পড়বে?

সমীর জবাব দিল, তাহা তার জানা নাই। তারপর যেন লোভ সামলাইতে না পারিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন আপনি?

—যাবো তো লাক্‌নাউ। কিন্তু উপস্থিত একবার বরাকরে হল্ট করবো কিনা!

গাড়ীটা চলিয়া গেল। সমীর তাহার ক্যাম্বিশের চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘগুলি চাঁদের উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চাঁদ নিশ্চল, কিন্তু মনে হইতেছে, সে অবিরাম ছুটিতেছে আর ছুটিতেছে, তাহার গতির আর বিরাম নাই। তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া সমীর ভাবিল, গতি কথাটার ঠিক সহজ অর্থটুকুই সব সময় ধরিলে চলে না। এইখানে এই চেয়ারের উপর সে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকিলেও আসলে কিন্তু সে ছুটিয়া চলিয়াছে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে, মন তাহার নাগালের বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। হোটেলের চাকরটা টিফিন্ ক্যারিয়ারে করিয়া খাবার আনিয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আহারে কেমন রুচি নাই। শুধু রকমারি চিন্তা এলোমেলো-ভাবে তাহার মাথায় আসা-যাওয়া করিতেছে। নির্জন সঙ্গীহীনতা মানুষের ভিতরের যত কিছু ভালো এবং যত কিছু খারাপ, সকলকেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সমীর চায়, তাহার এই একাকীত্বকে কাজে লাগাইতে। তাহার আশা আছে, এইখানে বসিয়া বসিয়া সে অনেক কিছু বড় কাজের উপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

ঘরের ভিতর হইতে একখানা বই আনিয়া সমীর পড়িতে সুরু করিল।

একটু পড়িতে-না-পড়িতেই কিসের একটা শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড একখানা মাল বোঝাই লরী রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল। আগাগোড়া ত্রিপলে ঢাকা, দুইপাশের ত্রিপলের ভিতর বাতাস ঢুকিয়া ঠিক যেন একটা অতিকায় পাখার ডানার মত সঞ্চালিত হইতেছে। তার ভারী গতির স্পন্দনটুকু সমীরের দেহে ও মনে কেমন একটা শিহরণ দিয়া গেল।

নাঃ এখানে এই রাস্তার উপরে বসিয়া পড়া সম্ভব নয়। সে উঠিয়া ঘরের ভিতর ক্যাম্পখাটে শুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল।

পড়িতে পড়িতে কখন এক সময় বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ কার ডাকাডাকিতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, একখানি বেশ বড় ঘেরা-মোটর আসিয়া পাম্পের কাছে দাঁড়াইয়াছে। একটি সুন্দর যুবা গাড়ী হইতে নামিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বুঝিল যে, ইঁহারই ডাকাডাকিতে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়াছে। সমীর তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে আসিয়া বলিল, কি চাই, বলুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়িল, গাড়ীর ভিতর মাত্র আর একজন—সামনের কৌচেই বসিয়া একটি সুবেশা সুন্দরী তরুণী। তন্দ্রার রেশটুকু তখনো তার মস্তিষ্কের আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছিল, সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই। মনে হইল, বুঝি এ তার ঘুমের দেশেরই কোন্ অপূর্ব কাহিনী, তাহার চোখের সামনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যুবকটি বলিল—চার গ্যালন পেট্রোল দিন। বলিয়া সে সিগারেট ধরাইবার জন্য খানিকটা দূরে সরিয়া আসিয়া খুব মৃদু শিস্ দিতে দিতে রূপার কেসের উপর একটা সিগারেট ঠুকিতে লাগিল। সেই সময় হঠাৎ মোটরের পিছন দিকটায় নজর পড়িতে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা কেসের ভিতর রাখিয়া মোটরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল,—এই উল্লুক কোথাকার!

সমীর সবেমাত্র পাম্পের হাতল নাড়িয়া পেট্রোল তুলিতেছিল, অবাক হইয়া সেদিকে তাকাইল। গাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েটি মিহি-গলায় বলিল,—কি হ'য়েচে? এ্যাঁ?

পিছন হইতে ভদ্রলোকটি ততক্ষণ একটা অপরিচিত লোককে টানিতে টানিতে আলোর কাছে লইয়া আসিল এবং বলিল,—উল্লুকটার কাণ্ড দেখেচ একবার! পিছনের লাগেজ-ক্যারিয়ারের ওপর কখন

উঠে একেবারে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বেমালুম শুয়ে রয়েছে। নিশ্চয় বেটা দাগী চোর, কিম্বা খুনে, কিম্বা—

যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার, সে ততক্ষণে হতভম্বের মত একজন হইতে আর-একজনের মুখের পানে তাকাইতেছিল। লোকটা হিন্দুস্থানী কি বাঙ্গালী ঠিক বোঝা যায় না। বয়স বেশী নয়, হয়তো পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জী, পরণে হাঁটু পর্যন্ত অত্যন্ত ময়লা জীর্ণ কাপড় এবং বগলে একটা কাপড়ে বাঁধা পুঁটুলি।

ভদ্রলোকটি বলিল,—আবার মুখের ভাব করেছে দেখ, যেন কত ভালমানুষটি! বাবা, এ-সব ন্যাকামি আমরা বুঝি। সোজাসুজি বল, নইলে পুলিশে তো হ্যাণ্ডওভার করবোই, তার আগে এই জুতোর ঘায়ে তোমার ন্যাকামী বার ক'রে ছাড়বো।

লোকটা কিন্তু তখনো নির্বাক। যেন অজস্র গালিগালাজের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবাদের এক বিন্দুও ভাষা ছিল না। হঠাৎ তার মুখের ভাব দেখিলে মনে হয়, লোকটা হয়তো বোবাই হইবে।

—নাঃ এমনিতে হবে না কিছু, না? বলিতে বলিতে প্রশ্নের তীক্ষ্নস্বরের সঙ্গে তাল রাখিয়া ভদ্রলোক জোরে একটা চড় কষাইয়া দিল সেই অপরাধীর গালের উপর এবং সে ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতেই বাঁ-হাতে আর একটা চড় লোকটার ডানদিকের গালে।

পরপর দুইটা চড় খাইয়াই লোকটা মাথা ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রাস্তার ঐ জায়গাটায় নূতন পাথর-কুচি দেওয়া হইয়াছিল। পড়িয়া গিয়া লোকটার হাতের ও পায়ের কয়েক জায়গা কাটিয়া গেল। একটা অস্পষ্ট কাতরধ্বনি করিয়া ডান হাতের কনুইটা চাপিয়া ধরিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েটি বলিল,—আচ্ছা পাজী তো, তবু

বল্‌বে না কিছু! নিশ্চয় ও কোথাও কিছু একটা কাণ্ড ক'রে এইভাবে পালিয়ে যাচ্ছিল।

ভদ্রলোকটি রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—ক্ষেপেছ? ব্যাটা পাকা বদ্‌মায়েস। দেখেচে, আমরা ছ'জনে যাচ্ছি, ঐভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে পথে কোথাও সুবিধে বুঝে ওপর-চড়া হ'য়ে লুটে পুটে নিয়ে স'রে পড়বে।

সমীর ততক্ষণে তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার প্রথমেই নজরে পড়িল, লোকটার ডান হাতের কনুই হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া তাহার নোংরা কাপড়ের উপর পড়িতেছে। সে তাহাকে বলিল,—আচ্ছা বে-কুব লোক তো! এমনি ক'রে মার খাবে, অথচ বলবে না, কোত্থেকে আসচে, আর কেন এভাবে—

মেয়েটি তাহার সঙ্গীকে বলিল,—আচ্ছা দরকারই বাঁ কি বাপু অত হাঙ্গামায়! একটা পাহারওয়ালাও কি এখানে নেই?

অপর লোকটা এবার হাতজোড় করিয়া একবার সমীরের ও একবার বাবুটির পানে চাহিয়া বলিল,—বহুৎ কসুর হুয়া বাবুজী! লেকেন ছোড়্ দেনা গরীব আদমীকো—

সমীর জিজ্ঞাসা করিল,—কোত্থেকে আসচো তুমি?

উত্তরে লোকটা যে-কথাগুলি বলিয়া গেল, তাহার মর্ম এই যে,—সে আসিতেছে কলিকাতা হইতে। যাইবে বেনারস। কিন্তু ট্রেণে যাইবার পয়সা না থাকায় হাঁটিয়াই বাহির হইয়াছে পথে। বেনারসে তাহাকে পৌঁছিতেই হইবে, তা সে যত শীঘ্র এবং যেমন করিয়া পারে। পথে আসিতে আসিতে একবার একখানা বোঝাই লরীর উপর উঠিয়া গা-ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িয়া খানিকদূর আসিয়াছিল, কিন্তু এক সময় লরীর লোকদের নজর পড়িতে তাহারা গালি দিতে দিতে নামাইয়া দেয় এবং তারপর আবার সে চলিতে সুরু করে। আরো অনেকখানি রাস্তা আসিয়া এই গাড়ীখানাকে সে দেখিতে পায়। কি

জন্য বলিতে পারে না, গাড়ীখানা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়াছিল। পথে একেবারেই আলো ছিল না। সেই অন্ধকারে সে চুপি চুপি পিছনের ঐ জায়গাটিতে উঠিয়া গুটি-সুটি মারিয়া শুইয়া পড়ে।

আকাশপানে তাহার যুক্তকর তুলিয়া লোকটা জানাইল,—চোর, ডাকাত বা খুনে কিছুই সে নয়। সে একজন মুসাফির, তার বেশী আর কিছুই নয়।

তাহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে সমীরের অন্তরের চিরতৃষিত পথিকটি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকুল ও উন্মুখ হইয়া উঠিল।

বাবুটি সিগারেট ধরাইয়া খুব জোরে গোটাকয়েক টান দিয়া বলিল, —আগাগোড়া সাজানো গল্প একটা।

গাড়ীর জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটিকে বলিল, তা'হলে কি করা যায় বল দিকিন্ ?

মেয়েটি বলিল,—কি আর করবে ? এখানে পুলিশের নাম-গন্ধও তো নেই···মরুক্‌গে, চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। পেট্রোল নেওয়া হয়েচে তো ?

সমীর বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি দু' গ্যালন।

বাবুটি বলিলেন,—আরে দু' গ্যালন কি মশাই ? চাইলুম চার গ্যালন, আর আপনি দু' গ্যালন দিয়ে বসে' রইলেন ?

সমীর তাড়াতাড়ি আসিয়া আবার পাম্পের হাতল ধরিল। পেট্রোল দেওয়া হইলে বাবুটি বলিলেন,—দাম কত ?

সমীর জবাব দিল,—আজ্ঞে, পাঁচ টাকা দু'আনা।

বাবুটি টাকা বাহির করিয়া সমীরকে দিলেন। টাকাটা হাতে পাইয়াই বিদ্যুতের মত সমীরের মাথায় একটা মতলব খেলিয়া গেল। সে আর একবার মুহূর্তমাত্র সেই পথিকের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হিঁয়াসে কাশীকা কিরায়া কেৎনা পড়েগা, মালুম হ্যায় ?

গাড়ীর ভিতরে মেয়েটি তখন এদিকে-ওদিকে কল-কব্জা টিপিয়া ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সমীরের কথায় মুসাফির যেন প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি বলিল,—ক্যা জানে মহারাজ! থোড়ি কম চার রূপেয়া হোনে সক্‌তা।

—আচ্ছা, এই লেও চারঠো রূপেয়া। চলা যাও টেইন্‌মে—

এই চারিটা টাকা হাতে পাইয়া মুসাফির লোকটাও যেমন আকাশ হইতে পড়িল, প্রায় তেমনি অবস্থাই দাঁড়াইল সেই বাবুটিরও। সে নিষ্পলক নেত্রে সমীরের পানে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি ততক্ষণে ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইল। বাবুটি শিস্ দিতে দিতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে উঠিল এবং যেন খানিকটা উপেক্ষার ধূম উদ্গার করিতে করিতে গাড়ী

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া লোকটা তখন সমীরের কাছে আসিয়া যুক্তকরে বারংবার তাহাকে অভিনন্দন জানাইল। সমীর তখন ছোট টেবলটির সামনে ইজি চেয়ারে আচ্ছন্নের মত বসিয়াছে। তাহার দেওয়া টাকা চারিটি টেবলের উপর রাখিয়া লোকটা মাটীতে বসিয়া তাহার বোঁচ্‌কার গাঁট খুলিতেছিল আর জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রেল-ষ্টেশন এখান হইতে কত দূর এবং কোন্ দিকে যাইতে হইবে?

সমীরের মনের ভিতর তখন কিসের যেন একটা তোলপাড় চলিয়াছিল। লোকটার কোন কথাই যেন তার কাণে পৌঁছিতেছিল না। অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবল এই কথাটাই ধ্বনিত হইতেছিল: এই অগ্রগতির যুগে পথ-চলা বলিতে পায়ে হাঁটিয়া চলাকে বুঝায় না। পথ চলিতে হইলে চাই নবযুগের ঐ পক্ষিরাজ। যে হতভাগার তাহা নাই—

হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিনের শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল,—এই মাত্র যে গাড়ীখানা চলিয়া গেল, খানিকটা দূরে গিয়াই সেটা রাস্তার উপরই দাঁড়াইয়াছে। বিস্মিত সমীর সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে গাড়ীটা ঘুরিয়া আসিয়া আবার ডিপোর আঙ্গিনায় ঢুকিল।

সমীর তার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবে কি উঠিবে না যখন ঠিক করিতে পারিতেছে না, সেই সময় মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিল—সেই বাবুটি একা নয়, তাহার সঙ্গিনীও।

মেয়েটির পরণে একখানি ফিকে ভায়োলেট রঙের ক্রেপ-সিল্কের সাড়ী আর ব্লাউস। ব্লাউসের হাতার নীচে হইতে ছ'খানি নগ্নবাহু একটা অপূর্ব অলস ভঙ্গিমাতে সেই দীর্ঘ ঋজু দেহখানির দুই পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। পায়ে জরীর কাজ-করা হিল্‌-উঁচু জুতা এবং বোধ করি সেই সুন্দর জুতাজোড়াটি ও ততোধিক সুন্দর চরণযুগলের সুষমাটুকু অব্যাহত রাখিবার জন্যই সাড়ীখানিকে গোড়ালি হইতে বেশ উঁচু করিয়া পরা।

বেচারা সমীর যে কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটি বেশ গম্ভীরভাবে বলিল,—বসুন, ব্যস্ত হবেন না। আপনি এই পেট্রোল-ডিপোতে চাকরী করেন বুঝি?

সমীর জবাব দিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মাইনে পান কত? বিশ-ত্রিশের বেশী নিশ্চয়ই নয়? অথচ, হঠাৎ এই একটা অচেনা বদমায়েসকে দাক্ষিণ্য দেখিয়ে চার টাকা খয়রাৎ করার উদ্দেশ্যটা শুনতে পাবো কি?

সমীর শুধু নির্বাক নয়, একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া এই কথা কয়টা শুনিল। মেয়েটি কোনদিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজহংসীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীমায় গ্রীবাখানি হেলাইয়া বলিল, মানে যে ওর কী, তা বোঝবার মত বুদ্ধি আমাদের আছে। আমাদেরকে টেক্কা দিয়ে

চম্‌কে দিতে চান, না? কিন্তু একটা চোর, ডাকাত বা খুনেকে প্রশ্রয় দেওয়াতে বাহাদুরী যে একেবারেই নেই, সে বুদ্ধি আপনার আছে কি? আমরা যাকে চোর ডাকাত বা খুনে মনে করে' পুলিশের হাতে দিতে চাইছিলুম, আপনি দিলেন তাকে টাকা। হয়তো আপনার কাছে এটা একটা চরম bravado-র ব্যাপার হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে ওটা—কি বলবো—sheer nonsense, বুঝলেন?

এইটুকু বলিয়াই মেয়েটি তাহার সঙ্গীটির হাত ধরিয়া বলিল,—চল। এবং পরমুহূর্তেই তাহারা পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

একখানা কালো মেঘে আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছিল। সমীরের মনে হইল, চাঁদ বুঝি আর কখনই ঐ মেঘের আড়াল হইতে বাহিরে আসিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে চাঁদ আবার মেঘের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে হাসির ফিনিক ছড়াইল।

সমীর চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারিল না। একটা অসহ্য অস্থিরতায় সে ডিপোর আঙ্গিনার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এতক্ষণে হঠাৎ তার খেয়াল হইল, কৈ, সে লোকটাকে তো আর দেখা যাইতেছে না! সে তো এইখানেই ছিল। নিশ্চয়ই সে তবে উহাদের ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছে। আহা বেচারা, যে নির্দয় প্রহার সে খাইয়াছে—

তখনি আবার মনে হইল, কিংবা হয়তো সে সত্যই পুলিশের ভয়ে—এমনও তো হইতে পারে যে, সত্যই লোকটা কোনো বদমায়েস, কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে গুরুতর কোনো অপরাধ করিয়া গা-ঢাকা দিতেছে, পুলিশের নামে তাই তার এত আতঙ্ক! খুনে বা ডাকাত

না হইতেও পারে, হয়তো কোনো দাগী চোর, সবে জেল হইতে বাহির হইয়া নূতন শীকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নহিলে পুলিশকে তার এত ভয় কেন ?

মেয়েটি হয়তো মিথ্যা বলে নাই ! বলার ভিতরকার অনাবশ্যক রূঢ়তা তার যত কটূই হোক, তবু কথাগুলো সে তো মিথ্যা বলে নাই। মাত্র ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকরী করিতে আসিয়াছে সে, পেট্রোল-বেচা টাকার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত তার মনিবের। কাল সকালেই মনিব নিত্যকার মত ডিপোতে আসিয়া খাতাপত্র দেখিয়া হিসাব মিলাইয়া তহবিল লইয়া যাইবেন। তখন ? অহেতুক বদান্যতার ঐ চারিটা টাকাকে সে কেমন করিয়া পূরণ করিবে ? তার নিজের পকেটে তো আছে আর মাত্র খুচরো কয় আনা পয়সা ! নিজের অবস্থার কথা এতটুকু না ভাবিয়া সে কিনা মনিবের তহবিল হইতে চারিটা টাকা খয়রাৎ করিয়া উদারতা দেখাইতে গেল ! এ অসম্ভব ধরণের পাগলামী লইয়া সে চাকরী করিবে কেমন করিয়া ?

আবার সে আসিয়া তার চেয়ারের উপর অত্যন্ত ক্লান্তভাবে গা ঢালিয়া দিল। হঠাৎ একবার টেবলের উপরে নজর পড়িতে সে উঁচু হইয়া বসিল। কি আশ্চর্য ! লোকটা যে টেবলের উপর হইতে সেই টাকা চারিটা লইয়া যায় নাই ! টেব্‌লের নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেই বোঁচকাটিও নাই। তবে নিশ্চয় সে উহাদের ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়িতে বোঁচকাটা তুলিয়া লইয়া পলাইয়াছে, কিন্তু টাকাটা উঠাইয়া লইবার অবকাশ পায় নাই।

টাকা কয়টা হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে করিতে সমীর একবার ওদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, যোজন-বিস্তারী পথ একটা বিরাট দৈত্যের মত দুইদিকে দুই বাহু মেলিয়া দিয়া নিশ্চেতন হইয়া পড়িয়া আছে। অজ্ঞাতে সেই অপরিচিত মুসাফিরের জন্য সমীরের বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু, পরমুহূর্তেই মন তার বিরুদ্ধ সুর তুলিল। হয়তো ওর কাহিনীটা আগাগোড়াই মিথ্যা। কাশী যাওয়ার গল্পটা হয়তো আগাগোড়াই সাজানো······হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই।

রাস্তার উপর দিয়া কয়েকজন পাহারওয়ালা ভজনসুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়া গেল।

সমীর ভাবিল, যাক, লোকটা বাঁচিয়া গেছে। এই লোকগুলো যদি আর আধঘণ্টা আগে এই দিক দিয়া যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাকে আজ কাশীর মায়া ত্যাগ করিয়া হাজত বাস করিতে হইত।

হ্যাঁ, সব দিক দিয়াই ভালো হইয়াছে। লোকটাও বাঁচিল পুলিশের হাত হইতে, এবং সেও বাঁচিল তার মনিবের লাঞ্ছনা হইতে। হয়তো ঐ চারিটা টাকার তহবিল গরমিলের জন্য তার অনেক কষ্টের পাওয়া এই চাকরীটাই খোয়াইতে হইত!

ভাবিতে ভাবিতে সমীর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই টাকা চারিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতরকার ড্রয়ারে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর যখন সে পুনরায় আসিয়া চেয়ারে গা এলাইয়া বসিল, তখন তার মাথার ভিতর প্রত্যেক শিরা-উপশিরা যেন তাতিয়া উঠিয়াছে। যেন এখানে বসিয়া বসিয়াই এইমাত্র বহু লোকের সঙ্গে সে দাঙ্গা করিয়াছে, এমনি উত্তেজিত এবং পরিশ্রান্ত সে। আপনার মনেই সে বলিতে লাগিল,—চোরকে চোর না বলিয়া তাহার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইতে যাওয়াতে যে ভাবুকতা, তাহার অপর নাম পাগলামী। আর, সত্যই যদি লোকটা নিরীহ পথিকই হয়, তাহা হইলে তার মত হতভাগ্য নিঃসম্বলের পক্ষে এই সুদূরের যাত্রা-পথকে পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করাই তো অবশ্য কর্তব্য। তা যদি সে না পারে, তাহা হইলে এই পথের পাশেই পড়িয়া মরিবে সে। তাহাতে এ সংসারে কার কতটুকু বা যায় আসে?

কতটুকু সময় এমনিভাবে কাটিয়াছিল কে জানে, হঠাৎ তার অসংলগ্ন চিন্তার মাঝখানে অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে তার চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই অপরিচিত পথচারী—তার সেই বোঁচকাটিকে বাহুপ্রান্তে ঝুলাইয়া।

সমীর আচ্ছন্নের মত প্রশ্ন করিল,—কি ?

লোকটা কাঁচুমাচু করিয়া মুখে খুব মৃদু একটু হাসি ফুটাইয়া জানাইল, হুজুর মেহেরবাণী করিয়া যে টাকা কয়টি দিয়াছিলেন, তাহা সে এখানে ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।

মাতালের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সমীর লোকটার মুখের পানে মুহূর্তমাত্র চাহিয়া রহিল। তারপর গম্ভীর রুক্ষস্বরে জবাব দিল,—কোন টাকাই সে এখানে ফেলিয়া যায় নাই। সে ভুল করিয়াছে।

নির্বাক লোকটা খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে টেবলের উপরে ও নীচে, এখানে সেখানে খুঁজিতে লাগিল। তারপর অত্যন্ত নিঃশব্দে আবার সেই রাস্তার বুকে নামিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দম্পতি

বিবাহের ব্যাপারটাকে সুব্রত কি-জানি-কেন রীতিমত একটা সমস্যার মত দেখিয়া আসিতেছিল। এ-সম্বন্ধে তার মনে কোথায় কি যে একটা বড়-রকমের 'কিন্তু' ছিল, তা' সে অতি-বড় অন্তরঙ্গের কাছেও প্রকাশ করিয়া বলিত না। শুধু নিজের মনেই সে এই রকম সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ছোট ভাইটির বিবাহ দিয়া তাহাকেই সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, নিজে কোন দিন ও-সব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে লইবে না।

কিন্তু সংসারী হইবার পূর্বেই ছোট ভাই পল্টু এক দিন অকস্মাৎ সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। শোকের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইতে সুব্রতর অনেকদিন কাটিয়া গেল। পৈতৃক ব্যবসায়, বিষয়-সম্পত্তি, জমিদারী যথেষ্ট থাকিলেও সুব্রত কয়েক মাস ধরিয়া তার কোনো দিকেই নজর দিল না। শুধু ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে চিঠি অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল। নায়েব-গোমস্তা-কর্মচারীরা লিখিয়া বাবুর কোন জবাব পায় না। অনেক সময় চিঠি মালিকের সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, হায়, এত বড় বংশের একমাত্র বংশধর এম্‌নি করিয়া সংসার ছাড়িয়া উদাসী হইয়া গেল!

সেই সময় হঠাৎ একদিন সুব্রত দেশে ফিরিল, তাহার সঙ্গে একটি অষ্টাদশী নববধু।

পূরবীর বাবা আউদ্-রোহিলখণ্ড রেলে চাকরীর পর অবসর লইয়া এলাহাবাদে স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। সেখানে কেমন করিয়া সুব্রতর সঙ্গে পূরবীর আলাপ। তাহার পর প্রেম এবং বিবাহ। সুব্রত তাই যখন-তখন তাহাকে আদর করিয়া বলে, বাঙ্গলা দেশ থেকে এত দূরে তুমি যে এমন করে আমার দর্পচূর্ণ করবার ষড়যন্ত্র করে ব'সেছিলে, তা কি ছাই একবার কল্পনাও করতে পেরেছিলুম !

পূরবী ছেলেমানুষের মত হাসিয়া বলে,—আচ্ছা, সত্যিই তুমি কি বিয়ে কর্‌বে না বলে পণ করে বসেছিলে ? ভারী দুষ্ট তো তুমি !

—কেন, দুষ্টুমীর কি পেয়েছ ?

—সংসারের সক্কলেই বিয়ে কর্‌ছে, আর তুমি কী এতো বড়ো পীর যে, বিয়ে করবে না ?

সুব্রত হা-হা করিয়া হাসির রোল তোলে। নূতন রাজ্যের নূতন এই আবহাওয়ার মধ্যে সে যেন আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে।

সুব্রত ঠিক করিল, বধূকে লইয়া কলিকাতায় থাকিবে। গ্রামে আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা আছেন, সকলেই তাহার বিবাহের সংবাদ পাইয়া বড়ই খুসী। তাহারা একান্ত অনুরোধ জানাইল, নববধূকে লইয়া একবার গ্রামের বাড়ীতে এসো। জ্ঞাতি-খুড়ামহাশয় লিখিয়াছেন, এখানে জাগ্রত কুল-দেবতা আছেন ; বৌমাকে নিয়ে এসে একবার ভাল করে তাঁর পূজো দেওয়া উচিত—যাতে তাঁর আশীর্বাদে চৌধুরী-বংশের দিন দিন উন্নতি হয়।

কাশী হইতে পিসীমা কি-একটা মাদুলী পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, বৌমাকে পর্‌তে দিও এটি। আর একটিবার এসে দু'জনে আমাকে দেখা দিয়ে যেও। নিতান্ত অথর্ব হয়েছি বাবা, নইলে নিজেই যেতাম তোমাদের দেখ্‌তে।

সুব্রত কিন্তু এ-সব কিছুই করিল না। পিসীমার মাতুলীটা হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া পূরবী হাসিয়া বলে,—কিসের মাতুলী এটা—বল না গো! কি হয় এতে? ওটা হাতে বাঁধলে আমি বাঁচ্‌বো অ-নে-ক কাল?

রসিকতার ঝোঁকে সুব্রতর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়,—ও মাতুলী পর্‌লে শীগ্‌গীর তোমার একটি—

পূরবী মুখ বাঁকা করিয়া বলিয়া ওঠে—আঃ, কী অসভ্য তুমি!

সুব্রত ইজিচেয়ারে হেলিয়া-পড়িয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বলে,—আচ্ছা, তা না হ'লে আমাদের এই বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয়, এ-সব কি বিশ্রী খাপ্‌ছাড়া লাগ্‌বে ভেবে দেখেছ কোনো দিন?

বলিতে-বলিতে সুব্রতর অন্তরের ভিতর কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা নিবিড় হইয়া ওঠে। কথাটা পূরবী কি ভাবে লইল, সেটুকু লক্ষ্য করিতেও সে ভুলিয়া যায়।

ইহার কয়েকদিন পরেই সুব্রতর নজরে পড়িল, পূরবী সেই ছোট্ট সোণার মাতুলীটি কোন্ সময় নিজের হাতে পরিয়াছে। সুব্রত অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিল। অবশ্য, পূরবী যে এটা কোনো কিছু মনে করিয়াই পরিয়াছে, এ-কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, মাতুলীর প্রতি আকর্ষণ তাহার চিরন্তন সংস্কার, তা গুণ তার যা-ই হোক্ না। তবু সুব্রতর মনে খুসির সীমা রহিল না।

পূরবী একা। সুতরাং আজকাল কার্যগতিকে সুব্রতকে যেখানেই যাইতে হয়, পূরবীকেও সঙ্গে লইয়া যায়। সে-দিন নায়েবের নিকট হইতে তাগিদ আসিল, অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও একবার গ্রামে না আসিলেই নয়। সুব্রত মহা দুর্ভাবনায় পড়িল।

কেন বলা যায় না, পূরবীকে গ্রামে লইয়া যাইতে তার একেবারেই অনিচ্ছা। পূরবী কিন্তু বাঁকিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই সে একা এখানে পড়িয়া থাকিবে না। তা ছাড়া, জীবনে সে কখনো পাড়াগাঁ দেখে নাই, এ-সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না।

সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেই হইল। কয়েকটা দিন নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে মহলে-মহলে ঘুরিবার পর সুব্রত গ্রামের বাড়ীতে ফিরিল। পূরবীকে বলিল,—তোমার কতো কষ্ট হচ্চে তো এখানে? নিজের খেয়ালে যেমন লাফিয়ে এলে!

পূরবী মুখ ভার করিয়া বলিল,—এখানে এসে তুমি এমনি করে সরে পড়্‌বে জান্‌লে কখ্‌খনো আমি আসতুম না।—বলিতে-বলিতে হঠাৎ তার দু'টি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, এবং পরমুহূর্তেই তাহা ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

সুব্রত তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলিল,—আচ্ছা পাগল তো! কালই তো আমরা ফিরে যাচ্ছি কল্‌কাতায়!

স্বামীর বুকে মাথা গুঁজিয়া পূরবী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। একটা কথাও বলিতে পারিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া সুব্রত বলিল,—পাড়া-গাঁ তোমার কেমন লাগ্‌লো—কৈ, বল্‌লে না তো?

—ভালো নয়, একদম্‌ ভালো নয়। আমি ম'রে গেলেও আর সেখানে যাচ্ছিনে। তুমিও যেতে পাবে না—তা বলে রাখ্‌ছি।

অন্য এক-সময় সে স্বামীকে বলিল,—আচ্ছা, তোমার মায়ের সেই বড় ছবিখানা এখানে আনিয়ে নাও না কেন? ভারী সুন্দর ছবি, আমার বড্ডই ভালো লাগ্‌লো! খুব ছেলেবেলার ফটো তাঁর, নয়? এই আমারই মতো বয়েসের হবে বুঝি?

সুব্রত অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল,—তা হবে হয়তো।

পূরবী বলিল,—তোমার একদম্ মনে পড়ে না তাঁকে? খুব ছোট্টটি ছিলে তুমি তখন, নয়?

—হ্যাঁ, বোধ হয় দশ দিন কি পনেরো দিন তখন আমার বয়স।

পূরবী মাথাটা এক পাশে অনেকখানি হেলাইয়া বিজ্ঞের মতো বলিল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি স-ব শুনিছি। তুলোর প্যাডের ওপর শুইয়ে তোমার পিসীমাই তোমাকে মানুষ ক'রেছিলেন। নয়?

হুঁ—বলিতে-বলিতে সুব্রত হাতের কাছের রেডিও-সেটের বোতামটা ঘুরাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মিশ্র-ভূপালীর খানিকটা মূর্ছনা নির্ঝর-ধারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিল।

সুব্রত বলিল,—ভারী চমৎকার গানটা তো? দাও তো ঐ প্রোগ্রামটা, দেখি, কে গাইছে!…ও, কুমারী উত্তরা বসু! বেশ উঁচু দরের গাইয়ে!

গান শেষ হইলে সুব্রত বলিল,—কেমন, ভালো লাগ্‌লো না?

—মন্দ নয়।…আচ্ছা, ওদের বিয়ে হয়নি এখনো? এ কুমারীটির কত বয়েস?

সুব্রত বলিল,—সেটা যদিও আমার জানা সম্ভব নয়, তবু ধরো না, বয়স বেশীই হয়েছে। বেশী বয়স পর্যন্ত অনেক মেয়েরই তো আজকাল বিয়ে হয় না। ওটা তোমার খুব খারাপ লাগে বুঝি?

পূরবী জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—একেবারেই না! বিয়ে হ'য়ে তো ভারী লাভ! তার চেয়ে মেয়েদের বিয়ে না-করা বরং অনেক ভালো।

তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সুব্রতর মনে হইল, কি-যেন একটা কথা বলিতে গিয়াও সে বলিতে পারিল না। অথচ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কথাটা যেন তাহাকে স্বস্তি দিতেছে না।

পরের দিন কিন্তু কুয়াশাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। সুব্রত নীচেকার ঘরে খাতাপত্র লইয়া একা বসিয়া কি-সব কাজ করিতেছিল, পূরবী ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমে সদরের দিকের দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সরিয়া আসিয়া সুব্রতর চেয়ারের হাতার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিল,—আজ আমার গা-ছুঁয়ে তোমাকে একটা দিব্যি কর্‌তে হবে!

সুব্রত অবাক্ হইয়া গেল।

—দিব্যি! কিসের দিব্যি? হঠাৎ—কথাবার্তা নেই, দিব্যি কর্‌তে হবে? কি দিব্যি কর্‌তে হবে শুনি?

ততক্ষণে পূরবী স্বামীর দু'খানা হাত দু' হাতে টানিয়া নিজের বুকের উপর খুব জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—আমাদের কোনো দিন···ছেলেমেয়ে কোনো দিন আমাদের হবে না, বলো আমার গা ছুঁয়ে!

হাসিতে গিয়া সুব্রত হঠাৎ যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল,—তার মানে?

পূরবী জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল,—কিছুই যেন জানো না তুমি! এ-কথা তোমাদের গাঁয়ের সকলেই তো জানে গো! শুধু তোমার মা-ই তো নন্, বাবার যিনি মা ছিলেন, তিনিও তো মারা যান্ আঁতুড়েই! তার আগেও···তোমাদের বংশের—

সুব্রত হঠাৎ বেশ জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—কে বলেছে তোমায় এ-সব আজগুবি কথা, বল তো? লোকের কি, একটা ছুতো পেলেই হ'লো! কে কবে কোথায় কি-জন্যে মারা গেছে, তার জন্যে বুঝি বংশের—

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি তো ভারী জানো। তোমাদের বংশের বড় ছেলের প্রথমকার বউ, কেউ কখনো বেঁচেছে বল্‌তে পারো? প্রথম একটি ছেলে হ'য়েই মরে গেছে সববাই।

সুব্রত হঠাৎ কি বলিবে খুঁজিয়া না-পাইয়া বলিল,—আমি কিন্তু ও-সব একেবারেই বিশ্বাস করিনে।

পূরবীর দু'টি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল,—তা তো করবেই না গো! তুমি জানো, আমি মরে গেলেও তোমার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে যেমন করেই হোক্। আমাকে তুমি একদম্ ভালোবাসো না!

সুব্রত বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল। মনে-মনে তার আপশোষের সীমা রহিল না—কেন সে পূরবীকে গ্রামের বিষাক্ত আবহাওয়ার ভিতর লইয়া গিয়াছিল! মহলের যা-হয় হইত, ইহার তুলনায় সে-ক্ষতির পরিমাণই বা কতটুকু!

পূরবী নীরবে কাঁদিতেছিল। সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইতে গেল। পূরবী সে আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই বলিল,—আমি মরে গেলে তোমার আর ক্ষতি কি বল? আবার তো তুমি—

সুব্রত তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারে না। সে তার হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

স্বামীর মুখের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া পূরবীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। হাসিতে-হাসিতে সে বলিল,—সত্যিই আমার এম্‌নি ভয় করে! এই দেখ না, যে-দিন থেকে ঐ-সব কথা শুনিছি, সে-দিন থেকেই পিসীমার মাতুলীটা আমি খুলে রেখেছি।

সুব্রত বলিল,—আচ্ছা মুস্কিল তো! ও-মাতুলীটা পিসীমা যে কেন পাঠিয়েছেন, তা বুঝি তুমি বুঝ্‌তে পারছো না! ওটা তোমার নিজেরই জন্যে। এই সন্দেহটা মেয়েদের মনে এম্‌নি পাকা হ'য়ে গেছে যে, আমি বিয়ে ক'রেছি শুনে, ঐ ভয়টাই তাঁর সব আগে মনে

হ'য়েছে। তাই তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করেই তিনি এই মাতুলীটা পাঠিয়েছিলেন, আর কিছু মনে করে নয়।

—তবে তুমি সে-দিন আমায় ও-কথা বল্‌লে যে বড়! এম্‌নি দুষ্টু তুমি!

এ-সংসারে সুখেরও যেমন কোন নির্দিষ্ট চেহারা নাই, তেমনই দুঃখেরও নাই। স্বামীর নিকট যে প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করিয়া পূরবী মনে একটা অপূর্ব আরাম অনুভব করিয়াছিল, কয়েকদিনের মধ্যে সেইটাই তাহার দারুণ অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল। সর্বদাই তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী যেন আজকাল একটু বেশী রকম গম্ভীর আর অন্যমনস্ক থাকিতেই ভালবাসে। আগের মত হাসি-গল্পে সে যেন আর প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারে না। পূরবীর মনে হয়, সে নিশ্চয় তাহারই উপর রাগ করিয়াছে। নিশ্চয়ই তাই, নহিলে বাড়ীতে আর কে আছে যে—

একদিন সে স্বামীকে বলিল,—তুমি আজকাল অমন করে থাকো কেন বল তো গো! আমার ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

বিস্মিত কণ্ঠে সুব্রত বলিল,—আমার রাগ হ'য়েছে? তা আবার তোমার ওপর? তুমি তো খাসা কল্পনা করতে শিখেছো!

—সত্যি, করোনি রাগ? এই আমার গা ছুঁয়ে বল।

সুদৃঢ় বাহুবন্ধনের মধ্যে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া সুব্রত বলিল,—না গো না, তোমার ওপর রাগ আমি করিনি—করিনি; কর্‌তে পার্‌বোও না কোনো দিন।

কিন্তু মুখের এই আশ্বাসটুকু ভোরের কুয়াশার মত অদৃশ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

সে-দিন কথায়-কথায় অনেক দিনের অনেক পুরাণো কথাই উঠিয়া পড়িয়াছিল। সুব্রত বলিল,—আমার জীবনের যা-কিছু জল্পনা-কল্পনা ওলোট-পালোট করে দিয়ে চ'লে গেল পল্টু।

কোনো দিন এ-কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি যে, আমরা এক-মায়ের ছেলে ছিলুম না। সে আজ বেঁচে থাকলে আমার জীবনের সবটুকু ধারাই যেতো বদ্‌লে। প্রয়াগ-তীর্থে শ্রীমতী পূরবীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও কোনো দিন হ'তো না। সুতরাং আজকের এই চৈতালী পূর্ণিমাতে তোমার সঙ্গে বসে—

পূরবী চাপা অভিমানের সুরে বলিল,—বিয়ে করায় যখন তোমার এতই আপত্তি ছিল, তখন সে দুষ্কর্ম করতে গেলেই বা কেন?

সুব্রত একটু ম্লান হাসিয়া মুহূর্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিল,—কেন? তা কি করে বলবো বল! ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলুম, মানুষের মনের ভেতর মুক্তির জন্যে যেমন একাগ্রতা আছে, তেমনি বন্ধনের স্পৃহাও তার কম নেই। বাহিরের মুক্তি যেমন একদিকে তাকে আকর্ষণ করছে, ছোট্ট একটি স্নেহনীড়ের মধুর বন্ধনও তাকে তেমনি ডাকছে। মানুষ নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণতা কোনো দিনই পায়নি—কোনো দিন পাবেও না পূরবী! তার পূর্ণতার অনেকখানি খোরাক সে সংগ্রহ করবে তার এই সঙ্কীর্ণতার নীড়টুকু থেকে; তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে এই সব বন্ধনের ভেতর থেকেই। এই রকমের একটা চেতনার ভেতর দিয়েই আমার জীবনে পূরবীর বাঁশী বাজলো, তার সুরের মধ্যে ঘরে-ফেরার সঙ্কেতটুকু নিয়ে। তাই, পরিশ্রান্ত দেহে ঘুরে-ঘুরে আর ঘর না বেঁধে উপায় রইলো না।

পূরবী একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—তা ছাড়া তোমাদের বংশের তুমিই যে একমাত্র ছেলে!

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিতে-চাপিতে বলিল,—তা, পল্টু চলে যাবার পর তো আমিই হলুম একা! সত্যিই, এ-কথাও আমার কত দিন মনে হয়েছে, যেন আমার বংশের অতীত আত্মাগুলি আমার দিকে চেয়ে আছেন তাঁদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এটাকে সংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারো পূরবী! কিন্তু এ ভয়ঙ্কর গভীর সংস্কার।

হয় তো এই সংস্কারও আমার হাত ধরে টেনে এনে আমাকে সংসার-রচনায় বাধ্য করলে।

রাত্রে বিনিদ্র নয়নে শয্যায় পড়িয়া-থাকিয়া পূরবী স্বামীর ঐ কথাগুলো লইয়া বারবার আলোচনা করিতেছিল। ও-পাশে খাটের উপর সুব্রত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। মাথার দিকের দেয়ালে ফিকে-নীল বেডল্যাম্প জ্বলিতেছে। সেই ঝাপসা আলোতে ঘরের ভিতর একটা অবাস্তবের স্বপ্নছায়া! পূরবীর একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীকে ডাকিয়া তোলে। উঠিয়া সে স্বামীর খাটের উপর গিয়া বসিল। স্বামীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া কিন্তু তাহাকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না। ঐ মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া আজ সন্ধ্যার কথাগুলি আবার একে-একে তার মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত কথাগুলির নীচে যে একটা অব্যক্ত অনুযোগ প্রচ্ছন্ন ছিল, পূরবী তাহা সুস্পষ্ট ধরিতে পারিয়াছে। বংশের একটি মাত্র ছেলে সে, এইখানেই এই বংশের যবনিকা পড়িবে না কি? এ-সব কথা ভাবিয়া স্বামীর মনে বেদনার অন্ত নাই, এবং তার জন্য সে নিশ্চয় পূরবীকেই দায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

সামনের দেওয়ালে তাহার শাশুড়ীর ছোট একখানি ফটো ঝুলিতেছে। ঝাপসা নীল আলোতে ফটোর চেহারাটা অস্পষ্ট দেখাইলেও তাঁহার মুখখানি যেন সুস্পষ্ট তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। আর ভাসিয়া উঠিল, গ্রামের বাড়ীর সেই মস্ত বড় অয়েল-পেন্টিংখানা। সে-মুখ যেমন সুন্দর, তেমনি জ্যোতির্ময়। যেন এক বিরাট ত্যাগের গরিমা তাঁর চোখে-মুখে জ্বলিতেছে। যেন নিজেকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াও তিনি তাঁহার সংসারকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। পূরবী তন্ময় হইয়া সেই ছবিখানির পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

কিছু দিন হইল, পূরবীর স্বাস্থ্যে যেন ভাটার টান পড়িতে সুরু হইয়াছে। সুব্রত এতদিন লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু হঠাৎ সে-দিন নিদ্রিতা পত্নীর পানে চাহিয়া-চাহিয়া তাহার মনে হইল, পূরবী এই কয়দিনে অনেকখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দু'টি চোখের কোণে একটা কালির দাগ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেন? পূরবীর কিছু অসুখ করিয়াছে না কি?

পূরবীকে কোন কথা না বলিয়া সে একদিন ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিয়া পূরবীকে বলিল,—তুমি বড্ড রোগা হ'য়ে যাচ্ছ। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, এতদিন চোখেই পড়েনি। ডাক্তার এসেছে, একবার তৈরী হ'য়ে নাও দেখি!

পূরবী হঠাৎ যেন রীতিমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বলিল, কি অদ্ভুত মানুষ! কথাবার্তা নেই, হঠাৎ ডাক্তার এনে হাজির! কিচ্ছু আমার হয়নি,—সত্যি কিচ্ছু না। তুমি ডাক্তারকে বিদেয় করে দাও—পায়ে পড়ি তোমার।

নিতান্ত অবাধ্য হইয়াই পূরবী আজ স্বামীর কথার ব্যতিক্রম করিল। অগত্যা ডাক্তারকে বিদায় দিতেই হইল।

কিন্তু বেশী দিন কাটিল না। স্বামীর উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার স্থানে আনন্দের লহর তুলিয়া কথাটা এক দিন প্রকাশ করিয়া ফেলিল পূরবী নিজেই। সুব্রত স্ত্রীর মুখের পানে নির্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে-দৃষ্টির নীচে তাহার উচ্ছ্বসিত পুলকটুকু পূরবীর কাছে ধরা পড়িতে দেরী হইল না। অভিমানে পূরবীর বুকের ভিতরটা ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু অভিমান চাপিয়া রাখিয়া চোখে-মুখে হাসির রং ধরাইয়া বলিল,—আমি রোগা হচ্ছি দেখে তোমার খুব ভয় হ'য়েছিল, নয়? ভয় নেই গো! এই ধাক্কা সামলাবার আগে আমি কিছুতেই মর্‌বো না, দেখে নিও।

হাসির আবরণ দিয়া পূরবী যে কী করুণতম কথাটা বলিতে চায় বুঝিয়াও সুব্রত কিছুই যেন বুঝিল না, মুখের এমনি একটা ভাব দেখাইল। কিন্তু, নিরালায় বসিয়া সে নিজের অন্তরকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। এই দুঃসহ আনন্দ-বার্তাটুকু পাওয়ার পর কি-যে তার করা উচিত, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। নিজের আনন্দকে সে অস্বীকার করিতে পারে না। অথচ সেই আনন্দের পিছনকার বিভীষিকার চেহারাটাকে সে ভুলিতে চাহিলেও পূরবী নিজেও ভুলিবে না,—তাহাকেও ভুলিতে দিবে না। নিজের মনকে সুব্রত বারম্বার বলিতে থাকে—মিথ্যা—মিথ্যা, কত বড় ভিত্তিহীন মিথ্যা যে এটা, তা' সে নিজে ভালো রকমই জানে। কিন্তু এই মিথ্যা আতঙ্কের কালো ছায়াটাকে পূববীর অন্তর হইতে কেমন করিয়া সে নিঃশেষে মুছিয়া দিবে ?

দিন যায়। স্বামিস্ত্রী উভয়ে যেন চেষ্টা করিয়াই ও প্রসঙ্গটা এড়াইয়া চলে। অথচ ঐ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া দু'জনেরই দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আজকাল পূরবী প্রায় সর্বক্ষণই সংসারের নানান্ কাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখে। সুব্রত ভাবে, মন্দ কি! পাঁচ রকম ব্যাপারে নিজেকে যতটা জড়াইয়া রাখিতে পারে, ততই তো ভালো!

সে-দিন কি-একটা বিশেষ প্রয়োজনে পূরবী বৈঠকখানা হইতে স্বামীকে বাড়ীর ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। দোতালায় শোবার-ঘরের পাশের ছোট ঘরখানি অ-দরকারী এলোমেলো জিনিষে সর্বদা পূর্ণ থাকিত। আজ সে-ঘরে পা বাড়াইয়া সুব্রত অবাক্ হইল। সমস্ত ঘরখানি আগাগোড়া ঝাড়িয়া-মুছিয়া তক্‌তকে করা হইয়াছে। দেয়াল-আলমারির কাচগুলি প্রায় সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাতে নূতন কাচ লাগানো হইয়াছে। আলমারির ভিতরে রকমারি খেলনা। স্প্রিং-দেওয়া রেলগাড়ী, মোটর, উড়োজাহাজ, ছোট-বড় রকম-রকম

পুতুল। মেঝের এক পাশে একটি ঝক্‌ঝকে নূতন ঠেলাগাড়ী, এবং ট্রাই-সাইকেল। সুব্রত স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া নির্বাক্‌ হইয়া রহিল। পূরবী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল ; পরে বলিল,—আমার হাতে যে-ক'টা টাকা ছিল, সব আমি তোমার ছেলের জন্যে খরচ করে ফেলেছি। আমায় দিও কিন্তু। আর আমার সেলাইয়ের কলটা খারাপ হ'য়ে গেছে, সেটা মেরামত করিয়ে দিতে হবে। ওর জন্যে কত কাজ যে আমার আট্‌কে আছে—

বলিতে-বলিতে সে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটি গলার উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া একটি ট্রাঙ্ক খুলিল। তারপর ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে একরাশ ছোট-ছোট রেশমী ও পশমী জামা বাহির করিয়া এক-একটি স্বামীর সাম্‌নে খুলিয়া ধরিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সুব্রত বলিল,—এ-সব তুমি নিজেই তৈরী ক'রেছ না কি পূরবী ?

—নইলে বাজার থেকে কিনে এনেছি বুঝি ? কিনে তো তুমিও দেবে। এগুলো—বলিয়া মুহূর্তমাত্র নীরব থাকিয়া আবার বলিল,—এ-সবই তোমাকে দেখিয়ে রাখছি আজ ! এর একটি জিনিষও যেন আমার নষ্ট না হয়। নষ্ট হ'লে স্বর্গে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবো না।

কোন জবাবই সুব্রত সহসা খুঁজিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল,—আমার ওপর তোমাকে কোনো ভারই দিতে হবে না পূরবী ! সে-ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি। সহরের সব-চেয়ে বড় ডাক্তার আর নার্সকে আমি—

পূরবী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছিল—অবোধ শিশুটির মতোই। শিশুরই মতো সরল অর্থহীন একটু হাসিতে তার ডান গালের নীচে সুন্দর একটু টোল্‌ পড়িয়াছিল। চোখ নামাইয়া বাক্সের ভিতর জামাপোষাকগুলি তুলিতে-তুলিতে বলিল,—ডাক্তার

তুমি আন্‌বে না, তাই আমি বলিছি বুঝি? কি রকম যে নিরেট তুমি হচ্ছো দিন-দিন—!

—তোমার কাণ্ড দেখে সত্যিই আমি বোকা ব'নে গেছি পূরবী! এ-ভাবে আরো কিছু দিন কাট্‌লে হয়তো বা সত্যিই পাগল হ'তে হবে আমায়!

হাসিয়া স্বামীর মুখের উপর মুখ তুলিয়া পূরবী বলিল,—তা হয়তো তুমি হবেও।...আচ্ছা, হ্যাঁ গো, পিসিমা তো তোমাকে মানুষ ক'রেছিলেন, কিন্তু তোমার তো কেউ নেই যে—

সুব্রত তাহার মুখের উপর হাত চাপিয়া বলিল,—কী নিষ্ঠুর তুমি পূরবী! ছেলে চুলোয় যাক্, আমি চাই তোমাকে!

পূরবী হঠাৎ স্বামীর হাতখানা ঝাঁকানি দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল,—আবার নিষ্ঠুর বলা হচ্ছে আমাকে! খবর্দার বল্‌ছি, আর কখ্‌খনো যদি মুখে আন্‌বে ঐ অলক্ষণে কথা! যে আজ সত্যি-সত্যি আমাদেরই এক জন হ'য়ে গেছে, তার সম্বন্ধে কি করে বল্‌তে পার্‌লে ও-কথা, নিষ্ঠুর কোথাকার! তোমার মা যখন তোমায় এতটুকু রেখে চলে গিয়েছিলেন, তখন যদি বাবা ঐ-কথা বল্‌তেন, তখন কী হতো তোমার বল তো শুনি!

বলিয়া পূরবী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে উদ্গত অশ্রুর বিন্দুটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা কিছুতেই গোপন রহিল না।

নির্দিষ্ট মেয়াদের নিষ্করুণ দিনগুলি যতই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, সুব্রতর চাঞ্চল্য ততই বাড়িয়া উঠিল।

জাগ্রতে ও নিদ্রায় কত এলোমেলো কথাই পূরবীর যে মনে হয়! মনে হয় এলাহাবাদে তাহাদের বাড়ীর কথা, মা-বাবা এবং ভাইবোন্‌গুলি। সেখান হইতে হঠাৎ একদিন অজানা

একজনকে আশ্রয় করিয়া এখানে চলিয়া আসা। জীবনে এত বড় বিমূঢ়তা আর কি থাকিতে পারে? কেন যে মানুষ এত বড় ভুল করে! মনে হয়, কালই স্বামীর নিকট জিদ্ ধরিবে, তাহাকে এলাহাবাদে রাখিয়া আসিবার জন্য। কিন্তু তখনই আবার মনে হয়, সুব্রত হয়তো দুঃখ পাইবে। নিদারুণ অভিমানের মাঝেও নিরভিমান স্বচ্ছন্দতা টানিয়া মনে-মনে বলে,—নাঃ, থাক্! দুঃখ সে কাহাকেও দিবে না। আত্মাহুতি সে দিতে আসিয়াছে, দিবেও নিতান্ত নিরুপদ্রবেই।

স্বপ্নে এক-একদিন মনে হয়, তাহাকে যেন কে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। চীৎকার করিয়া সে কাঁদিতে চায়, পারে না। কে একজন তাহার পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করে। প্রথমটা ভাল নজর পড়ে না, তার পর দেখে, সুব্রত! কিন্তু, কী বিশ্রী বিকট তাহার মূর্তি! কী কুৎসিত তাহার হাসি! ভয়ে পূরবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ঠিক পাশেই নিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখের উপর চোখ পড়ে। চোখ কিন্তু যেন সরিতে চায় না সে-মুখের উপর হইতে। একান্ত নির্ভরতায় সে মাথাটি চাপিয়া ধরে ওর প্রশস্ত বুকের নীচে।···

সে-দিন এলাহাবাদ হইতে একখানা চিঠি আসিল সুব্রতর নামে। পূরবী চিঠিখানা একান্ত সাগ্রহে স্বামীর হাত হইতে টানিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িতে গেল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পড়া হইল না। চিঠি হাত হইতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পূরবীও আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িল।

হঠাৎ দিন-দুইয়ের জ্বরে পূরবীর মা'র মৃত্যু হইয়াছে। সেই নিদারুণ বার্তা আসিয়াছিল ঐ পত্রখানিতে।

কিন্তু সুব্রত পরে বুঝিল, ওটা শুধু উপলক্ষ মাত্র। এই শোকের

ধাক্কায় পূরবী শয্যা গ্রহণ করিল, এবং দুই দিন যাইতে-না-যাইতে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞা হারাইল।

জ্বরের ঘোরে পূরবী কতকি যে বলে, কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। দু'খানি বিশীর্ণ পাণ্ডুর বাহু বাড়াইয়া সে কাহাকে যেন খুঁজিতে থাকে।

সুব্রত কাছে বসিয়া আছে, বরফের ব্যাগ মাথায় ধরিয়া। ও-পাশে নার্স, তার সামনে ডাক্তার। হঠাৎ এক সময় নির্নিমেষ বিহ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া পূরবী বলিল,—মা! মাকে ডেকে দাও না একবার! আমি মরে যাচ্ছি, আর সে বুঝি···মা গো মা, কী নিষ্ঠুর সকলে—কী দারুণ নিষ্ঠুর!

সুব্রত ডাকিল,—পূরবী!

আস্তে-আস্তে পূরবীর চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। মনে হইল, পরম শান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল বুঝি!

দুই দিন দুই রাত এমনি জ্বরের ঘোরে কাটিয়া গেল। দুই জন নার্সের হাতে রোগীর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া সুব্রত চুপ-চাপ উপরের ঘরে বসিয়া থাকে। মনে-মনে যে বিভীষিকাকে সে এত দিন জোর করিয়া অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, সে আজ তাহার সমস্ত বীভৎসতা লইয়া তাহাকে স্তম্ভিত—আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূরবীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিবার ক্ষমতাটুকুও তাহার আর নাই।

কত কথাই আসিতেছে মনে। বিবাহ সে করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ টিকিল না। নিয়তির সুনিশ্চিত অনুশাসন! যে নিদারুণ অভিশাপ এই চৌধুরী-বংশের বুকের উপর পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে এড়াইবার জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিবাহ করিবার পরেও ভাবিয়াছিল, ও-কথাটা পূরবীকে কখনো জানিতে দিবে না, কিন্তু পূরবী জানিল। পূরবী

যদি কিছুই না জানিত, তাহা হইলে আসলে কিছুই হয়তো ঘটিত না। নিরন্তর একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া—কিন্তু উপায় কি, অনিবার্যকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে? ঠিক এই অনিবার্য নিয়তির চক্রে কোন্ সুদূর প্রবাস হইতে পূরবী আসিল তাহাদের এই অভিশপ্ত সংসারের বধূত্বের মাঝে আত্মাহুতি দিবার জন্য। এ তার অনিবার্য কঠোর নিয়তি!

হ্যাঁ, সুব্রত নিশ্চিত বুঝিয়াছে, পূরবী মরিবে। এই বংশের ভবিষ্যৎ বংশধরটিকে রাখিয়া তাহাকে মরিতেই হইবে, যেমন একদিন তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার জননী। পিসীমা তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন কি অপরিসীম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া! কিন্তু সুব্রত কেমন করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে পূরবীর শিশু-সন্তানটিকে?

মনে পড়িল, ও-ঘরে পূরবীর অনাগত সন্তানের জন্য সেই অপূর্ব আয়োজন। না, পূরবীর শেষ সাধনাকে সুব্রত অপূর্ণ রাখিবে না। যেমন করিয়া হোক্, দুর্ভাগা ছেলেটাকে সে বাঁচাইয়া তুলিবে। অতঃপর ঐটুকুই হইবে সুব্রতর জীবনব্যাপী সাধনা।

ভাবিতে-ভাবিতে সুব্রতর মনে হইল, ঐ কঠোর কর্তব্যসাধনটুকুই তাহার জীবনের চরম এবং পরম সত্য। পূরবীর জীবনের উদ্দেশ্য যেমন শুধু সেই সন্তানকে পৃথিবীর বুকে আনিয়া দেওয়া, তাহার নিজের জীবনের উদ্দেশ্যও তেমনি তাহাকে এই পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তা ছাড়া তাহাদের জীবনের আর কোন মূল্য নাই। পূরবীর কর্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহার ব্রত সুরু হইতে চলিয়াছে।

ডাক্তার সুব্রতকে ডাকিয়া বলিলেন,—যে-রকম অবস্থা দেখ্ছি, তাতে শিশু আর প্রসূতি দু'জনেরই জীবন বিপন্ন। তবে আমাদের চেষ্টায় বড়-জোর এইটুকু সম্ভব হ'তে পারে, দু'জনের মধ্যে এক

জনের আশা ছেড়ে দিয়ে অপরটিকে বাঁচিয়ে তোলা। যদি প্রসূতিকে বাঁচাতে হয়, শিশুর আশা ছাড়্তে হবে। আর যদি শিশুকে চান্, তবে—

সুব্রত কাঠ হইয়া রহিল। কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ডাক্তার বলিলেন,—এ-কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করাও যে কত নিষ্ঠুর! কিন্তু না করলেও নয়।

সুব্রত বলিল,—আমি বলছি আপনাকে একটু পরেই। মিনিট পনেরো আমায় সময় দিন ভাববার!

তাহার ইচ্ছা হইল, একবার পূরবীর ঘরে গিয়া দেখিয়া আসে, কিন্তু পা উঠিল না। সে বরাবর তিনতলার ছাদের উপর উঠিয়া গেল।

ভরা-শ্রাবণের অমাবস্যা। এইমাত্র খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে গোটাকয়েক তারা দেখা দিয়াছে। বর্ষা-বিধ্বস্ত ধরিত্রী যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। শুধু তার নিশ্চেতন দেহের গভীর নিশ্বাসের শব্দটুকু মাত্র শোনা যাইতেছে। চারিদিকে মৃত্যুর কালো ছায়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে।

সুব্রতর মনে হইল, ঠিক এমনি এক বিভীষিকাময়ী রজনীতে সে-ও আসিয়াছিল তাহাদের অভিশপ্ত বংশের বর্তিকাটুকু বহিয়া। আজ আবার ঠিক সেই অভিশাপের মধ্য দিয়া আসিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ বংশধর।

ডাক্তার বলিতেছে, পূরবীকে বাঁচাইতে হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হয়। অথচ, সুব্রত নিজে তো বুঝিতেছে, পূরবীকে বাঁচাইতে পারে, এমন সাধ্য বুঝি স্বয়ং বিধাতারও নাই।

অতীত দুঃস্বপ্নের মত কত কথা ভীড় করিয়া আসে মনে! কিন্তু উন্মত্তের মত সুব্রত সে-সব দু'হাত দিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়।

মিথ্যা—মিথ্যা। মৃত্যু যখন দুয়ারে পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া, তখন মিথ্যা এই ভালবাসার অজুহাত! ভালবাসা দিয়া পূরবীকে বাঁচানো যায় না,—অসম্ভব! কিন্তু চেষ্টা করিলে হয়তো বাঁচানো যায় পূরবীর সন্তানটিকে। সে বাঁচিলে পূরবীর স্মৃতিটুকুও অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকিবে।

পাশের বাড়ীতে এগারোটা বাজিয়া গেল। সুব্রতর যেন চমক্ ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। ডাক্তারকে সাম্নে দেখিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল,—ছেলেটাকে যদি বাঁচাতে পারেন ডাক্তার বাবু, তারই চেষ্টা করুন। অন্য চেষ্টা বৃথা।

আর এক মুহূর্তও না দাঁড়াইয়া সে বরাবর বৈঠকখানায় আসিয়া পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া বসিল।

সারা রাত্রিটা সেই ভাবেই কাটিল। ভোরের দিকে কখন্ একটু টেব্‌লের উপর মাথা রাখিয়া সুব্রত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিতে নার্স খবর দিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটিকে বাঁচানো যায় নাই। পূরবী মিনিট-দশেক পূর্বে একটা মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে।

রুদ্ধনিশ্বাসে সুব্রত জিজ্ঞাসা করিল,—আর সে—

নার্স জানাইল,—অবিশ্যি, ইনি এখনো বেঁচে।—তবে—

আর-কিছু নার্সও বলিল না, সুব্রতও শুনিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

তেমনি জীবন-মরণের মাঝখান দিয়া সে-দিন এবং রাতটাও কাটিয়া গেল। সমস্ত দিনরাত্রির ভিতর সুব্রত একবারও উপরে উঠিতে পারিল না।

তার পর একটি-একটি করিয়া অনেকগুলি দিবস ও অনেকগুলি রজনী তাহাদের লোহার মত ভারী পা ফেলিয়া এই বাড়ীর বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই চরণ-চিহ্ন

বুঝি এ-বংশের ইতিহাসে কোনো দিন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে না।

মাস-দুই পরে অকস্মাৎ একদিন এ-বাড়ীর ঘর-দ্বার প্লাবিত করিয়া শরতের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার বন্যা বহিল। আকাশ হাসিল, এ-বাড়ীর সব কিছুই হাসিল। কারণ, আজ এক জন্মান্তরের পরেই বুঝি এ-বাড়ীর গৃহিণীর মুখে হাসির ঝিলিক্ ফুটিয়াছে।

দোতালার বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারের উপর পাতলা নরম গদী পাতিয়া সুব্রত পূরবীকে শোয়াইয়া দিয়াছিল; এবং নিজে তাহারই পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া-লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহার অসুখের সময়কার কত কি কাহিনী। পূরবীর কাছে এ-যেন নব-জীবনের অরুণালোকে গত জীবনের তমসাচ্ছন্ন স্বপ্ন-কথা!

ক্ষীণকণ্ঠে পূরবী বলিল,—নার্স সে-দিন বল্‌ছিল আমায় সব। বল্‌লে, এম্‌নি অবস্থা দাঁড়ালো যে, একজনকে বাঁচাতে গেলে আর-একজনের মায়া ছাড়্‌তে হয়।···তোমায় বুঝি বলেছিল ওরা তাই?

সুব্রতর মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গেল সমস্ত আকাশ ও সমস্ত জ্যোৎস্না। চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল, সেদিন ছাদের উপরকার সেই বিভীষিকাময়ী শ্রাবণ-রাত্রি। সে-রাত্রির সুব্রতকে আজ সে নিজেই যেন চিনিতে পারিল না। গলার ভিতরটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া আজ সে পূরবীকে বলিবে, সে-দিনের সমস্যাটার সে কি নির্মমভাবে সমাধান করিয়াছিল। সে যে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে না—

খুব মিষ্ট ফিকে একটুখানি হাসিয়া পূরবী বলিল,—ওরা বুঝি জিজ্ঞেস্ কর্‌লে তোমায়? আর তুমি কি বল্‌লে? বল্‌লে যে আমাকেই চাও? সত্যি, বল না?

সুব্রত তাহার কপালের উপরকার কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছটি নাড়িতে-নাড়িতে বলিল,—নইলে বল্‌বার আর কি ছিল পূরবী !

পূরবীর শীর্ণ কম্পিত ঠোঁট দু'খানির ফাঁকে শুধু অস্ফুট সুরে বাহির হইল,—কী নিষ্ঠুর তুমি গো !

ধীরে ধীরে চোখ দু'টি তার মুদিয়া আসিল অপূর্ব স্বপ্নাবেশে। সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস টানিয়া সুব্রত মনে-মনে বলিল,—সত্যিই চেয়েছিলুম আমি তাই পূরবী ! সে রাত্রির সবটাই ছিল মিথ্যা, সবটাই ছিল নিষ্ঠুর বীভৎসতায় ভরা।

একখানি শীর্ণ হাত পূরবী তার স্বামীর দিকে বাড়াইয়া দিল। সুব্রত সেটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিড়াল-শিশু

খেয়ালী দামোদরের পারাপারের একটা ঘাট। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ধান-চালের বেশ বড়-রকমের বাজার। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অসংখ্য লোক পারাপার করিতেছে, শ্রেণীবদ্ধ গরুর গাড়ীতে ধান বোঝাই হইয়া ও-পার হইতে এ-পারের আড়তে আসিতেছে। শীর্ণ স্রোত-ধারার দুইটি রেখা সুদূর-বিস্তীর্ণ বালুরাশির বুক চিরিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার একটির মাঝখানে গভীরতা কিছু বেশী। সেখানে এখনো নৌকার প্রয়োজন হইতেছে। অন্যত্র হাঁটিয়া পার হওয়া চলে।

ও-পারের বনরেখার মাথায় সোণার কুচি ঢালিয়া সূর্য ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিতেছে। হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে এবং তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বালুকণাগুলি গায়ে আসিয়া বিঁধিতেছে। শুষ্ক বালির উপর পা ছড়াইয়া আধ-শোয়া অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া নিবারণ কি যেন ভাবিতেছিল। তাহারই খানিক দূরে কতকগুলো গরুর গাড়ী তাহাদের মাল নামাইয়া দিয়া এটা-সেটা সওদা কিনিয়া ও-পারের গ্রামের দিকে ফিরিতেছে। নিবারণ শূন্যদৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল।

পিছন হইতে কে একজন বলিল,—কি রে ভাই, তুই দিব্যি আরামে বালির ওপর পড়ে পড়ে কি ভাবছিস্ বল দিকিন্? একটুখানি নেশা করাতে পারিস্?

মুখ ফিরাইয়া কণ্ঠে অনেকখানি বিরক্তি ঢালিয়া নিবারণ বলিল,—কি চাই, নেশা ? মানে, পচুই ? না, তাড়ি ?

মনাই হাসিমুখে বলিল,—না রে ভাই, না, পচুই নয়, তাড়িও নয়। একটা বিড়ি দিতে পারিস্ যদি, তো তাই দে।

নিবারণ তাহাকে একটা বিড়ি দিয়া বলিল,—দেশলাই চাইলে মাথা গুঁড়িয়ে দেবো কিন্তু! এত বড় বাজার ঘুরে কোথাও একটা দেশলাই পাবার জো নেই।

মনাই হাসিয়া বলিল,—আমার কাছে চক্‌মকি আছে রে, ভাবনা নেই।

মনাই চক্‌মকি ঠুকিয়া বিড়ি ধরাইল। এবং জোরে একটা টান্ দিয়া বলিল,—ধান আজ কতো ক'রে গেল দেখ্‌লি! ষোল টাকা! শুনিচিস্ কখনো ? এক-এক বেটা এক গাড়ী ক'রে ধান বিক্রী করে লাল হ'য়ে বাড়ী ফিরলো।

নিবারণ বলিল,—তাতে আমার কি! তুই তো তবু বাবুদের দোকানে দু'বেলা খেতে পাচ্ছিস্, আমার যে তাও বন্ধ হলো। আজ সারাদিন ঘুরে মোটে আট আনা রোজগার করেচি। একবেলা খেতেই তো ফয়ার!

—যা বলেচিস্!

—বসে' বসে' তাই ভাব্‌চি, কি করা যায়! না-খেয়ে মরার চেয়ে চুরি করা ভালো। তাই করবো কি না ভাবছি।

—মন্দ কি! অবিশ্যি, যদি-না পড়ো ধরা!

—পড়ি, সে-ও ভালো। তবু পেটের ভাবনা তো ঘুচে যায়! আধ সের চাল নইলে যার একবেলা পেট ভরে না, তার এ-বাজারে চলে কোত্থেকে বল্ দিকিন্ ? তেরো গণ্ডা পয়সা ফেল্‌লে তবে এক সের চাল!

—তাইতো হয়েচে রে ভাই। শুন্‌চি, কোল্‌কেতায় এত ভিকিরি জড়ো হয়েচে যে, রোজ অমন দু'-তিনশো মরচে।

নিবারণ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বলিল,—আরে, সেখানকার বড় বড় কথা ছেড়ে দে না। আমাদের এখানেই ভিকিরির আমদানী কি রকম বেড়েচে, দেখছিস্‌নে। দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমি নিজে খেতে পাইনে, আমার ঘাড়ের ওপর ভর করলো কি না কোথাকার একটা হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। ক'দিন হলো, সে রোজ এসে আমার কাছে ধর্ণা দেবে। এমন ঝঞ্চাটেও মানুষে পড়ে!

সমস্ত আকাশ হইতে একটা যেন পাতলা ধূমের যবনিকা বালুকাময় নদীগর্ভে নামিয়া আসিতে লাগিল। দূরের গাছপালা অদৃশ্য হইয়া আসিতেছে। দু'জনে বালুকাশয্যা ছাড়িয়া বাঁধের দিকে উঠিতে লাগিল।

দূরের একটা আবছায়া মূর্তির পানে আঙুল দেখাইয়া নিবারণ বলিল,—ঐ দেখচিস্‌, ছোঁড়াটা এসে দাঁড়িয়েচে। সমস্ত দিন দেখা পাওয়া যাবে না, মনে হয়, ঘাড় থেকে নাম্‌লো বুঝি। কিন্তু ঠিক সময়ে—

মনাই বলিল,—তা, পুণ্যি হবে রে ভাই, পুণ্যি হবে, তবু এক জনকে এক মুঠো ভাত দিতে পারলে! ইস্‌, কী চেহারা! কাদের ছেলে রে? এলো কোত্থেকে?

নিবারণ বলিল,—কি করে' জান্‌বো বল্‌? বলে, মা মরে' গেছে। বাপ ছেড়ে পালিয়েচে! বোধ হয় নিজের পেটের জ্বালায়। আমার অপরাধের মধ্যে একদিন দেখে ভারী মায়া হয়েছিল, নিজে ডেকে একটা আধ-আনি দিয়েছিলুম। ব্যস্‌, আর যায় কোথা! ক্যাংলা আর এ শাগের খেতটুকু ছাড়তে চাইছে না।

ছেলেটার কাছে আসিয়া নিবারণ বলিল,—কি বাবা চোদ্দপুরুষ, এসে হাজির হয়েচ? আজ আমারই যে একমুঠো জোট্‌বার রাস্তা দেখচিনে!

মনাই নিজের মনিব-বাড়ীতে চলিয়া গেল। নিবারণ ছেলেটাকে বলিল,—আচ্ছা, রোজ তুই আমার কাছেই আসিস্ কেন বল্‌তো ? কোন্ দিন রাগের মাথায় হয়তো তোর হাড়গুলো আমার হাতে গুঁড়ো হয়ে যাবে হতভাগা !

ছেলেটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—সারাদিন কিছু খেতে পাইনি বাবা।

মুখ ভেঙ্‌চাইয়া নিবারণ বলিল,—তবে আর কি ! গা জল করে দিলে ! তোর মা গেল মরে', বাপও না খেতে দিতে পেরে কোথায় সরে' পড়্‌লো, আর আমি শালাই কি চোরের দায়ে ধরা পড়ে' গেলুম ! কাল তো তোকে বলে' দিলুম, আর আসিস্‌নে কোনো দিন।

হাত-মুখের এক অপূর্ব ভঙ্গী করিয়া ছেলেটা বলিল,—এক মুঠো মুড়ি দাও বাবা, আর কিছু না।

—ওরে আমার নবাব-পুত্তুর, মুড়ি খাবে ? তোমার ঐ হাড়-জিরজিরে পেটের মধ্যে এক টাকার মুড়ি এখ্‌খুনি কোথায় তলিয়ে যাবে যে বাপধন ! মুড়ি খাবে ? হ্যা হ্যা হ্যা, বলে কি ছোঁড়া !··· বেরো—বেরো !

কিন্তু নিবারণের চলার পিছনে-পিছনে ছেলেটারও পা চলিতে লাগিল।

ক'দিন হইতে শরতের আকাশ মেঘে মেঘে একেবারে কালো হইয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি নামিতেছে। লোক-চলাচল, মাল-আমদানী ওঠা-নামা সবই এক রকম বন্ধ। খেয়া-নৌকা এ-পার ও-পার করিতেছে। কিন্তু লোকজন নিতান্ত কম। নেহাৎ দায়ে না পড়িলে এ দুর্যোগে কেহ ঘরের বাহির হইয়া নদীর এই বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে না।

নিবারণ দিন-মজুরি করিয়া খায়। বাজারের এখানে সেখানে যেমন তেমন কাজ তার জুটিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু মজুরি যাহা মিলিতেছে, তাহাতে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া দুষ্কর। তার উপর, সেই অযাচিত অতিথিটি তাহাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিতেছে না।

মাকড়দের গুদামঘরের বাহিরের দাওয়ায় সে রোজ রাত কাটায় এবং তাহারই এক কোণে খানিকটা ছেঁড়া চট্ টাঙ্গাইয়া আড়াল করিয়া তাহার মধ্যে রান্না করে।

সেদিন সন্ধ্যার পর এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি বেশ জোরে নামিয়াছিল। দাওয়ার উপর অনেকক্ষণ গুটিসুটি মারিয়া পড়িয়া পড়িয়া নিবারণ কালো আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সেখানে সবটাই অন্ধকার। বুকচাপা অন্ধকারে প্রকৃতি যেন অন্ধ হইয়া গেছে।

নিবারণ এক সময় উঠিয়া তাহার রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। ভূষা-পড়া হাঁড়ির মধ্যে ও-বেলার ভাত আর গোটাকতক কচুসিদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা ও কাঁচা পেঁয়াজ।

মাটীর সান্‌কিতে ভাতগুলো ঢালা শেষ হইয়াছে, এমন সময় চটের পাশে উস্‌খুস্ শব্দ হইল। সেই সাদা বিড়ালটা বুঝি এতক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, এখন আসিয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া দেখিল, বিড়াল নয়, মানুষ। সেই হাড়-জিরজিরে ছোঁড়াটা আবার আজ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় সে ছিল এতক্ষণ? কেমন করিয়াই বা আসিল? ইতিপূর্বে ক'বার তার কথা নিবারণের মনে হইয়াছে, এবং এই ঝড়বৃষ্টিতে আজ আর সে এ-মুখো হইতে পারিবে না, এই চিন্তায় বেশ যেন একটু আরামও অনুভব করিয়াছিল। এখন হঠাৎ তাহাকে চোখের সামনে দেখিয়া সে নির্বাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। মূর্তিমান্ দুর্ভিক্ষের চেহারা! সব ছাপাইয়া তার ঐ চোখ দু'টি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতই জ্বলিতেছে।

নিবারণ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে, ভাত খাবি ?

উত্তর হইল—হ্যাঁ।

ঐ একটি অক্ষরের ভিতর দিয়া সে যেন তার সমস্ত জীবনী-শক্তিটুকু ঢালিয়া দিল। এমন করিয়া 'হ্যাঁ' বলিতে নিবারণ জীবনে আর কাহারো কাছে কখনো শোনে নাই। সে বলিল,—আচ্ছা আয়, বোস্।

বলিয়া সে কাছের একখানা শালপাতা টানিয়া লইয়া তাহাতে কতকগুলো ভাত বাড়িয়া দিল। মনে মনে বলিল, ভাতে ঠিক দু'জনের পেট না ভরিলেও মোটের উপর দু'জনেরই খাওয়া চলিবে! উপবাসের চেয়ে ঢের ভালো বৈ কি! তাছাড়া এই সজীব দুর্ভিক্ষকে চোখের সামনে রাখিয়া সে খাইবেই বা কেমন করিয়া ?

কাঁচা পেঁয়াজ ও কচুসিদ্ধ একপাশে পড়িয়া রহিল। কাঁচা লঙ্কা টিপিয়া ও একটুখানি নুন মাখাইয়া ছেলেটা ঠাণ্ডা ভাতগুলো গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। নিবারণের চোখের পলক বুঝি পড়িল না, সে হাঁ করিয়া ছেলেটার খাওয়া দেখিতে লাগিল। ছেলেমেয়ে-স্ত্রী লইয়া সংসার জমাইবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তার কোন দিন হয় নাই, কিন্তু এই বুভুক্ষু ছেলেটার সামনে ভাত বাড়িয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া এক অপূর্ব মমতায় তার বুকখানা ভরিয়া উঠিতেছিল। সত্যই হয়তো ছেলেটা সারাদিন ধরিয়া দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়াও কোথাও একটি তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নহিলে মানুষে এমন করিয়া খাইতে পারে ?

হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ছেলেটার পাতা খালি হইয়া গেছে এবং সে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিতেছে। সে তাড়াতাড়ি যেন খানিকটা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল,—আর নিবি ? এই নে।

বলিতে বলিতে সে তাহার নিজের সানকির সব ভাতগুলোই তাহার পাতে ঢালিয়া দিল। ছেলেটা একবার নড়িয়া-চড়িয়া আসনপিঁড়ি

হইয়া বসিল এবং পেঁয়াজ-কুচিগুলি কচুসিদ্ধর সঙ্গে মাখিয়া পরম আরামে তাহার আহারের দ্বিতীয় পর্ব স্বুরু করিয়া দিল।

তাহার খাওয়া শেষ হইতে সামান্য একটুখানি বাকী আছে, এমন সময় নিবারণের যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। তাই ত! সে এখন নিজে খাইবে কি? ক্ষুধার জ্বালা যেন সহসা তাহার দেহের সর্বত্র একটা সুতীক্ষ্ণ বেদনার সঞ্চার করিয়া গেল। চোখের সাম্‌নে তাহার সঞ্চিত আহার্যের শেষ কণিকাটুকু এমনি করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতে দেখার মর্মান্তিক ব্যথা যেন এতক্ষণে তাহার বুকের কিনারায় আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পুর্বে যে মমতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন কেমন করিয়া উবিয়া গেল! একটা কুৎসিৎ সরীসৃপ যেমন পর্যাপ্ত আহারের পরেও লক্‌লকে জিহ্বা বাহির করিয়া আরও আহার্যের জন্য এদিকে-ওদিকে মাথা নাড়ে, ঐ ছেলেটার পানে চাহিয়া তুলনায় সেই ছবিটাই এখন নিবারণের চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল।

বাহিরে দুর্যোগ তখনো পূরামাত্রায় চলিয়াছে। বৃষ্টির একটু উপশম হইলেও বাতাস যেন আরও দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিবারণ পর্দা সরাইয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় দামোদরের বিশাল বক্ষ অতি ভয়াবহ দেখাইতেছে। সেইখানে সেই ঝড়ো বাতাসের মাঝখানে বসিয়া নিবারণ শূন্যদৃষ্টিতে সেই অন্ধকার নদীগর্ভের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সে যখন পর্দার ভিতরে আসিল, ছেলেটা তখন এক পাশে পড়িয়া গভীর ভাবে ঘুমাইতেছে। হঠাৎ মনাইয়ের কথা মনে পড়িল,—'পুণ্যি হবে রে ভাই, পুণ্যি হবে।' এই যে নিজে না খাইয়া সে ঐ অপরিচিত ছেলেটাকে খাইতে দিল, ইহাতে তাহার সত্যই পুণ্য হইল না কি? কে জানে!

আপনার মনেই একটুখানি হাসিয়া এক পাশে ক'-আঁটি খড়ের উপর পাতা চটের থলিয়ার উপর শুইয়া সে চোখ মুদিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, ছেলেটা তার আগেই উঠিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। নিজের তার শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা হইতেছিল না। মনে মনে বলিল,—নিজে উপবাসী থাকিয়া এত-বড় নেমক্-হারামকে খাইতে দেওয়ায় পুণ্য তো নাই-ই, বরং পাপ আছে যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোনো দিন ঐ হতভাগাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা যে তার পক্ষে নূতন নয়, এটুকুও তার অজানা ছিল না।

আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। আড়তগুলিতে আবার কাজের ভিড় জমিতেছে। দু'চারখানা গাড়ীও ও-পার হইতে এ-পারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু গরু ও গাড়ী লইয়া সকলেই যেন বেশ সন্ত্রস্ত! সকলের মুখেই এক কথা, নদীতে হড়্কা নামিবে। রায়েদের বড়বাবু বলিতেছেন, ক'দিন ধরিয়া রামগড় আর ধানবাদে প্রচুর বৃষ্টির ফলে আজ দুপুর নাগাদ এখানে যোল ফুট জল আসিয়া পৌঁছিবে। সুতরাং সকলে সাবধান!

বেলা আন্দাজ দু'টোর পর সত্যই বন্যা আসিয়া পৌঁছিল। ক্রুদ্ধ ফেনায়িত জলরাশির বিপুল উচ্ছাস হঠাৎ দামোদরের বিশাল বালুকা-গর্ভের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ভাসাইয়া ছাপাইয়া একাকার করিয়া দিল। গৈরিক জলরাশি স্থানে স্থানে বিপুল আবর্ত রচনা করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহে ছুটিতে লাগিল।

সূর্য অস্ত যাইতে আর বড় বেশী দেরী নাই। ও-পার হইতে খেয়া-নৌকা এখনো এ-পারে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তাহারই প্রতীক্ষায় বাঁধের উপর অনেকগুলি যাত্রী বসিয়া আছে। মাঝে

মাঝে এক একজন জোরে ডাক-হাঁক করিয়া ও-পারের মাঝিদের শীঘ্র শীঘ্র এ-পারে আসিবার জন্য তাগাদা দিতেছে।

নিবারণও যাত্রীদের কাছে আসিয়া বসিয়া আছে। ক'জন বাবু নৌকায় ও-পারে যাইবেন, তাঁহাদের সঙ্গে মালপত্রও কিছু বেশী পরিমাণে আছে। নৌকায় মালপত্রগুলো গুছাইয়া তুলিয়া দিলে কিছু মোটা বখসিস্ মিলিবে।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া পৌঁছিল। নিবারণ মালপত্র লইয়া নৌকায় তুলিয়া দিল এবং বাবুদের হাত ধরিয়া একে একে উঠাইয়া দিল। একজন বাবু নিবারণের হাতে এক টাকার একখানি নোট দিলেন।

নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিবারণ আড়তের দিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ নজরে পড়িল, ঠিক তার সাম্‌নের আঁকড় গাছটার তলায় সেই ছোঁড়াটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিবারণ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—কি বাবা, আবার এসেচ যে! হুঁ হুঁ, আজ আর কিচ্ছু হচ্চে না। বেশী চালাকি করবে তো—

ছেলেটা বলিল,—সকাল থেকে কিছু খাইনি বাবা।

নিবারণ বলিল,—তাতে আমার কি রে হতভাগা?

পিছনে মনাইয়ের গলা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধের উপর একখানা হাত পড়িল।

—ওরে, দেখ্ দেখ্, ভারী মজার ব্যাপার তো! বলিয়া মনাই নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

নিবারণ দেখিল, সত্যই একটা মজার ব্যাপার।

খেয়া নৌকার খানিক দূরে, নদীর স্রোতের উপর একটা কলার ভেলা ভাসিয়া চলিয়াছে, এবং ভেলার উপরে একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। বিড়ালটার গলায় বগলসের মত দড়ি বাঁধা, এবং যতদূর

দেখা যাইতেছে, সেই দড়ির একপ্রান্ত ভেলার সহিত বাঁধা। অসহায় বিড়ালটা ভয়ে যেন অসাড় হইয়া ভেলার উপরে বসিয়া সেই খরস্রোতে অনির্দেশ পথে ভাসিয়া চলিয়াছে।

নিবারণ নির্বাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মনাই হাসিয়া বলিল,—লোকটার কিন্তু বুদ্ধি আছে বল্‌তে হবে।

নিবারণ বলিল,—কার ?

—যে এই ব্যবস্থাটা করেচে। ওরে ভাই, আমি নিজেও যে একবার একটা বেড়াল পুষেছিলুম। উঃ সে কী নাকাল, তোকে কি বল্‌বো! তাড়িয়ে দিয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে' দাও, দশ মিনিট পরে দেখবে পাঁচিল টপ্‌কে আবার এসে সে তোমার পায়ের কাছে মিউ-মিউ করচে। এ-পাড়া থেকে নিয়ে গিয়ে ঐ একেবারে গাঁয়ের শেষে ছেড়ে দিয়েও দেখেচি, সে ঠিক আবার এসে হাজির হয়েচে।

নিবারণ হঠাৎ এক-মুখ হাসিয়া বলিল,—ঠিক এই আমার বাপধনের মতো!

মনাই বলিল,—আমার কিন্তু এ-বুদ্ধি হয়নি। হাঃ হাঃ হাঃ। নিশ্চয় সে বেচারা ঐ বেড়ালটাকে কিছুতেই আঁট্‌তে না পেরে শেষে এই মতলব করেচে। ও-শালার জাত একবার পিছু নিলে কিছুতেই আর তোমার সঙ্গ ছাড়বে না।

নিবারণ যেন এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিল। সে হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বাঃ! বেড়ে করেচে, খাসা করেচে তো! ঠিক হয়েচে। বেটার যেমন কর্ম তেম্‌নি ফল। নাও, এখন যাও কোথায় যাবে জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে। বাঁচতে হয় বাঁচো, মরতে হয় মরো,—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! বেড়ে মজা করেচে কিন্তু।

বলিতে বলিতে মনাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—বুঝ্‌লি রে, তাইতো বল্‌ছিলুম, আমারও ঐ বেড়াল পোষার দুর্ভোগ হয়েচে।

মনাই বলিল,—তাইতো দেখচি। ঠিক সময়টিতে এসে দাঁড়িয়ে মিউ-মিউ করচে।

নিবারণ বলিল,—দুঃখের কথা বলিস্ কেন? কাল সারা-রাত আমার উপোস গেছে। সব ভাতগুলো ও-ই গিলেচে। উঃ, সে খাওয়া যদি ওর দেখ্‌তিস্! এক-একবার মনে হচ্ছে তাই—বলিয়া সে একবার ছেলেটার দিকে এবং একবার নদীর দিকে চাহিল। ছেলেটাও ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া একবার নিবারণের দিকে ও একবার অতল জলস্রোতের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মনাই তাহাদের উভয়ের পানে চাহিয়া একটা উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

নিবারণ বলিল,—সকাল থেকে আর আসিস্‌নি যে রে হতচ্ছাড়া! ছিলি কোথায়?

ছেলেটা কোন জবাব দিল না।

নিবারণ বলিল,—আরে ম'লো যা। কথা বল্‌চিস্ না যে? মতলব কি? ভাত খাবি?

তবু কোনো জবাব নাই।

নিবারণ বলিল,—তবে মর্‌গে যা। তুই-ই খেতে পাবিনে। আজ দেখচিস্, অনেক পয়সা আমার হাতে। কি খাবি বল্। বলিয়া সে নিজের ডান হাতে নোট ও কতকগুলো রেজকী মেলিয়া ধরিল।

ছেলেটা কিন্তু যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এক-পা আগাইয়াও আসিল না, একটা জবাবও দিল না।

নিবারণের হঠাৎ মায়া হইল। কাল রাত্রে সেই যে খাইয়াছিল, নিশ্চয় তাহার পর হইতে আর কোথাও আহার জোটে নাই। মুখখানা তাই মড়ার মত শুকাইয়া গিয়াছে।

নিবারণ হাত বাড়াইয়া বলিল,—আয়, খাবি চল্।

ছেলেটা হঠাৎ কয়েক-পা পিছাইয়া গেল। চোখে তার ভয়চকিত। নিবারণ বলিল,—আরে মলো, আবার পিছোস্ যে! শোন্ বল্‌চি।

সে তাহাকে ধরিতে গেল।

ছেলেটা দৌড়াইতে সুরু করিল। নিবারণও তার পিছু পিছু

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘন হইয়া আসিতেছে। বুনো গাছপালার মাঝখান দিয়া ছেলেটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নিবারণও ছুটিল, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না। অনেকখানি ছুটিবার পর সে আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

সেই সান্ধ্য নদীস্রোতের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া নিবারণ দেখিল, ভেলায়-বাঁধা বিড়াল-শিশুটাও আর নজরে পড়িতেছে না।

উন্মাদ রজনী

পূর্ববঙ্গের এই ছোট্ট শহরটি আসামের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া। পাট ও ধানের আমদানী রপ্তানিকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার যৎসামান্য সমৃদ্ধি। অথচ, কবে এবং কেমন করিয়া যে এখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী যুবকের প্রেরণায় এই সংস্কৃতি-সাধনার মন্দিরটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

নদীর উপরে ছোট দোতালা একখানি বাড়ী। নদীর কোল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ইহার সংলগ্ন বাগানখানি একদিন গন্ধে-বর্ণে অপরূপ ছিল। আজ তাহাতে মালিন্য আসিয়াছে। বাগান আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে, নদীর বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ভিতরে, নীচেকার হলঘরখানিতে কয়েক আলমারী বই এখনও সঞ্চিত হইয়া আছে এবং দেওয়ালের গায়ে দেশের বড় বড় নামজাদা সাহিত্যিকদের ফটো ঝুলিতেছে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে একটা মাইনর স্কুল চলিতেছে। বিভাস সেই স্কুলের প্রধান মাষ্টারের চাকরী লইয়া এ শহরে আসিয়াছে।

চাকরিটা নগণ্যই। তবু এখানকার আবহাওয়াটুকু বিভাসের মন্দ লাগে না। লাইব্রেরী ঘরের ভারটাও তাহারই উপর পড়িয়াছে। তাছাড়া কিছুদিন হইল, এখানে এ-আর-পি'র ওয়ার্ডেন পোষ্ট হইয়াছে এবং বিভাসই এখানকার পোষ্ট-ওয়ার্ডেন। মাষ্টারির মাহিনা ছাড়া মাসকাবারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, বিভাসের পক্ষে সেটা কম কথা নয়।

রাত্রেও এখানে এই হলঘরখানিতেই সে থাকে। একপাশে একটি দড়ির খাটিয়ার উপর পাতলা একখানি তোষক বিছাইয়া তাহাতেই তার রাত কাটে। আগে সে বাজারের ভিতর একটা মেসে থাকিত। সেখানকার সঙ্গীদের বেশীর ভাগই স্থানীয় মুন্সেফী আদালতের আমলা এবং মুহুরী। সেখানকার আবহাওয়া বিভাসের অসহ্য মনে হইত। চিরকালই সে লেখাপড়া লইয়া থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু মেসের ভিতর আর যা কিছুর অবকাশ থাকুক, লেখাপড়ার এতটুকু অবকাশ ছিল না। সেখান হইতে উদ্ধার পাইয়া বিভাস যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছে।

এখানে সে সম্পূর্ণ একা। দিনের বেলা মাষ্টারির কাজে কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার একটু পরেই মেসের চাকর তাহার খাবার রাখিয়া যায় এবং তারপর হইতে আর কেউ তাহাকে বড় একটা বিরক্ত করিতে আসে না। এ-আর-পি'র ওয়ার্ডেনদের ডিউটি ভাগের সময় এই রাত্রের ডিউটিটা সকলেই এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, বিভাস কিন্তু পরমানন্দে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মনে মনে সে বলে, এ সুযোগটুকু না মিলিলে কোন্‌দিন হয়তো মাষ্টারির চাকরিটাই ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইত।

অনেকদিন হইতেই লেখার বাতিক আছে বিভাসের। এখানে, এই নির্জন রজনীগুলির কক্ষতলে বসিয়া তাহার সাহিত্য-সাধনা চলে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। লাইব্রেরীর বইগুলির বহুদিনের ধূলা ঝাড়িয়া সে বাছিয়া বাছিয়া পড়িতে সুরু করে। এমন করিয়া পড়িবার সুযোগ সে জীবনে কখনও পায় নাই, পাইবার আশাও ছিল না। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সে বলিত, জীবনে আমি আর কিছু চাইনে, চাই শুধু আমার নিজস্ব একটি লাইব্রেরী, আর যেমন তেমন একটা চেয়ার টেবল।

বন্ধুরা ঠাট্টা করিয়া বলিত, অর্থাৎ ওমর খৈয়ামের নবতম সংস্করণ! কিন্তু, সাকীটি সে বাদ পড়ে যাবে!

বিভাস বলিত, ও-সবের বালাই নেই আমার। ভালো একখানা বই, সে-ই তো আমার সত্যিকারের সাকী!

এখানে বসিয়া পরম খুসির সহিত সে মনে মনে বলিত,—জীবনের সাধ আমার এখানে আসিয়া পূর্ণ হইয়াছে। ভাগ্যিস্ জাপানীরা বর্মা দখল করিয়া বসিয়াছিল, নহিলে এ সুযোগ কোনও দিনই মিলিত না। যুদ্ধ যতদিন চলে, ততদিনই তার পক্ষে ভালো।

কথাটা একদিন সে তাহার সঙ্গী ওয়ার্ডেনদের কাছে প্রকাশ করিয়া বলায় তাহাকে তারা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল।

একজন বলিয়াছিল,—তোমার মতো এই সব অদ্ভুত জীবগুলো যতদিন না দেশের বুক থেকে নির্বাসিত হচ্ছে, ততদিন এর কোনও আশা ভরসা নেই। একদিন শুভক্ষণে আসামের সীমান্ত পার হ'য়ে জাপানী বোমা এসে তোমার এই ওয়ার্ডেন পোষ্টের মাথার ওপর পড়তে পারে, সে খেয়ালটা রাখা হয়েছে কি?

বিভাস বলিল,—তাতে হয়েছে কি! আমিও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবো পৃথিবীর বুক থেকে, যেমন পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণী গেছে এবং যাচ্ছে।

সঙ্গীরা বলিয়াছিল,—তখন কোথায় থাকবে তোমার ঐ দিস্তে দিস্তে হিজিবিজি-কাটা কাগজের বস্তা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিভাস বলিয়াছিল,—ওরাও যাবে। কিম্বা, হয়তো আমি মরে' গেলেও ওরা মরবে না। এখানকার ভগ্নস্তূপ সাফ্ করবার ভার যাদের ওপর পড়বে, তারা তাদের উদ্ধার করবে এবং

একজন না একজন সমঝ্‌দার মিল্‌বেই, যে বুঝবে, ওরা মরে নি—ওরা কোনও দিনই মরবে না।

সঙ্গীরা বলিয়াছিল,—বদ্ধ পাগল কোথাকার!

সেদিন রাত্রে কি একখানা বই পড়িতে পড়িতে ঐ চিন্তাটাই মাথার ভিতর উদ্দাম হইয়াছিল। সঙ্গীরা তাহাকে পাগল বলে, কিন্তু পাগল আসলে তাহারাই, যারা এই পৃথিবীব্যাপী মহাপ্রলয়ের স্বরূপটুকু উপলব্ধি করিতে পারে না। পৃথিবী ছুটিয়াছে প্রবাদের পতঙ্গের মতো ধ্বংসের সর্বনাশা অগ্নিশিখার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে। হয়তো তাই তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। হয়তো এই বিরাট লোকক্ষয়, সভ্যতার এই উৎসাদন, সত্যই হয়তো ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। মানুষ মরিবে, আবার নূতন মানুষ তাহাদের নব-নব আশা-আকাঙ্ক্ষা—নব-নব প্রেরণা লইয়া দেখা দিবে। শহরের পর শহর পুড়িয়া ছারখার হইবে, আবার সেই মহাশ্মশান হইতে নূতন বিস্ময়কর শহর মাথা তুলিবে তাহার অভিনব হর্ম্যরাজি লইয়া। পোল্যাণ্ড গিয়াছে, ফ্রান্স গিয়াছে, নিশ্চয় আবার নূতন পোল্যাণ্ড ফ্রান্স গড়িয়া উঠিবে। হয়তো এই মহাপ্রলয়ে আমাদের এই বাঙ্গলাদেশ আবার সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু নিশ্চয় আবার সে একদিন নূতন শ্যামলিমায় উজ্জীবিত হইয়া সূর্যরশ্মিকে আলিঙ্গন দিবে। তাহাতেই বা দুঃখ কি?

রাত্রি গভীর হইয়াছিল। উপরের ঘড়িতে ঢংঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। বই মুড়িয়া সে তাহার খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু নিদ্রা আসিল না। খোলা জানলাটার ধারে ঝাউগাছের চামরগুলিতে যেন কিসের কানাকানি চলিতেছে। বাতাস বেশ একটু জোরে বহিতেছে, ঝাউয়ের শব্দে যেন কার হাসির শব্দ স্পষ্ট কাণে আসিতেছে। মনে হইতেছে, ঘরের ভিতরে

সে একা, বাহিরে কিন্তু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য লোক হাসাহাসি করিতেছে।

নীচেকার ঘড়িতেও ঢংঢং করিয়া তুইটার ঘা পড়িল। অদ্ভুত এই ঘড়ি-বাজার শব্দগুলো! এখানকার এই নির্জন রাত্রির একাকিত্বে ওগুলোকে শুধু শব্দ বলিয়া মনে হয় না যেন। মনে হয়, ওরাও এক-একটি সজীব প্রাণী, রজনীর এই নির্জনতার সুযোগে সজাগ প্রহরীর মতো তাহার আশেপাশে চলাফেরা করিতেছে।

নিদ্রার প্রতীক্ষায় বিভাস চোখ বুজিল। একবার মনে হইল, ঘুম যখন আসিবেই না, তখন সেদিনকার লেখাটা আরো একটু আগাইয়া রাখিলে তো মন্দ হয় না।

তখনই কেমন একটা অবসন্ন চেতনার সঙ্গে মন বলিল, কিন্তু লিখিয়া লাভ কি? ওরা তো ঠিকই বলিয়াছে, কোথায় পড়িয়া থাকিবে ঐসব লেখা?

নিজের মনেই সে জবাব দেয়, আমার লেখার তো কোনো দামই নাই, কিন্তু যুগে-যুগে যাচাই হইয়া যে-সব লেখার নিশ্চিত উচ্চমূল্য নির্ধারিত হইয়া গেছে, তাহারাই বা কোথায় থাকিবে? ইউরোপের এই মহাতাণ্ডবে কত বিরাট লাইব্রেরী তাহাদের যুগ-যুগ ধরিয়া সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তাহার হিসাব কয়জন রাখিতেছে?······

শেষ পর্যন্ত নিদ্রা আসিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের নিদ্রা নয়। নিদ্রার ভিতরেও মস্তিষ্কের বিশ্রাম নাই। কত এলোমেলা স্বপ্ন—কত দেশবিদেশের স্বপ্ন—বাঙ্গলার গণ্ডী ছাড়াইয়া মন তাহার কত অপূর্ব বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল নিদ্রার সেই স্বল্প অবসরটুকুর ভিতর।

হঠাৎ এক সময় অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধের ভিতর দিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সে একবার ভাল করিয়া হলঘরের

চারিদিকে তাকাইয়া লইল। নিজেকেই সে অত্যন্ত মূঢ়ের মতো প্রশ্ন করিল, বেলজিয়ামের যুদ্ধে মেটারলিঙ্কের সাধনাগার জার্মানীর বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে নাকি ? কে জানে ! অদ্ভুত স্বপ্ন বটে !

শূন্যদৃষ্টি দেয়ালের যেখানে গিয়া নিষ্পলক হইয়া রহিল, সেখানে দেখা গেল, দুইটি বড় বড় চোখের তারা ঠিক তারই চোখের উপর স্থির হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ঐ বড় ছবিখানা গতবৎসরে এখানকার সাহিত্যরসিক মুন্সেফবাবু এই লাইব্রেরীকে উপহার দিয়াছেন। কী অপূর্ব ঐ দুটি চোখ !

পাশের ছবিটার পানে দৃষ্টি পড়িল, জ্ঞানবৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র। তার পরের খানা মধুসূদনের। বিভাসের মুগ্ধদৃষ্টি হলঘরের চারিদিকের দেওয়ালে ঘুরিতে লাগিল। বাঙ্গলার সংস্কৃতি-সাধনার মূর্ত-প্রতীক এইসব মহর্ষিগুলি যেন তাহার চোখের সামনে হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা অব্যক্ত বেদনার চাপে তাহার অন্তর বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

বিগত রজনীর অপূর্ব স্বপ্নের রেশটুকু মনের গভীরতম গুহায় একঘেয়ে সুরে বাজিয়া চলিয়াছে। আজ যেন বিভাসের কোনো কাজেই উৎসাহ নাই। অত্যন্ত পরিচিত দৈনন্দিন কাজগুলো আজ যেন কেমন একটা অবাস্তবের ছায়ায় অদ্ভুত মনে হইতেছে। এবং নিজেকে ইহাদের মাঝে একটা অচেনা আগন্তুক বলিয়াই বোধ হইতেছে যেন।

বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঐ যে মেয়েটা মাটির কলসী লইয়া বাগানের ভিতরকার চলা-পথটুকু পার হইয়া চলিয়া গেল, উহাকেও সে নিত্যই তো দেখিতেছে, তবু আজ যেন উহাকেও নূতন বলিয়া ঠেকিল। নদীর ঠিক উপরেই উঁচু জমিটুকুর উপর ঐ যে তার খড়ো ঘরখানি আজও নদীগর্ভে বিলীন না হইয়া খাড়া হইয়া আছে.

তাহার ভয়াবহ অবস্থাটা মেয়েটাকে তো কোনোদিন উন্মনা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। নিশ্চিন্ততার এই অবস্থাটা যতই মারাত্মক হোক তবু বাঞ্ছনীয় বৈকি! ঐ লইয়া ভাবিয়া মরিলে কিই-বা করিতে পারিত সে! অমনি নিশ্চিত মৃত্যুর কিনারায় সকলেই তো আমরা বাস করিতেছি, সুতরাং দুশ্চিন্তা করিয়া লাভ কোথায়? দূরের ঐ বস্তীর লোকগুলি কেমন পরম নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের কাজ করিয়া চলিয়াছে! একদিন যদি সত্যসত্যই আকাশ হইতে শত্রুর আক্রমণ সুরু হয় এই শহরের পরে, কোথায় থাকিবে ওরা? এ-সমস্যা উহাদের মনে কোনদিনই হয়তো জাগে নাই। নিজেও যদি সে অমনি করিয়া থাকিতে পারিত!

মেয়েটা আবার শূন্য কলসী লইয়া ঘাটে আসিতেছে। সে কাছে আসিলে বিভাস হঠাৎ তাহাকে বলিয়া বসিল,—আচ্ছা, তোমার কোনো ভয় করে না ঐ কুঁড়ে-ঘরটাতে থাকতে? যে কোনোদিন তো ওটা ভেঙ্গে নদীর জলে পড়তে পারে!

মেয়েটা একবার একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে মুচকি হাসিয়া জবাব দিল,—না-হলে কোথায় থাকবো গো বাবু, বলেন তো! বলিয়া আবার একটুখানি হাসির সঙ্গে বেশ-একটু কটাক্ষ মিশাইয়া মাথার কাপড়টি আরো একটু টানার ভাণ করিয়া চলিয়া গেল।

বিভাসের মনে হইল, অদ্ভুত! হোক্ ছোটলোকের মেয়ে, তবু ও-জ্ঞানটা তো থাকা দরকার! ছোটলোক বলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো কাহারও চেয়ে কম নাই। তাহার প্রমাণ ঐ তাহার কটাক্ষের ইঙ্গিত আর ঐ হাসি। বাঁচিবার স্পৃহা ওরও কম নয়! এই যে বাগান জুড়িয়া আজ আগাছার ঝোপ গজাইয়া উঠিয়াছে, উহাদেরও পাতায় পাতায় সবুজের লীলা-স্পন্দনের অভাব নাই। বাঁচিতে ওরাও চায়, কিন্তু জানে না, ওরা বাঁচিবার অধিকার পাইয়াছে শুধু কোনো খেয়ালীর খেয়ালের উদারতায়।

কিন্তু, কেন যে আজ এইসব অসংলগ্ন চিন্তা বিভাসের মনে মনে জট্ পাকাইয়া উঠিতেছে, তা সে নিজেও বলিতে পারে না। গত রজনীর চিন্তাজালের সঙ্গে কোথায় যে ইহার প্রচ্ছন্ন সংযোগ আছে, কে বলিবে?

সঙ্গী ওয়ার্ডেন আসিয়া চুপি-চুপি জানাইল, শুনেছ হে, কাল কলকাতায় বোমা পড়েচে।

বিভাস বলিয়া উঠিল, মিথ্যা কথা!

বিপিন বলিল, তার মানে? কলকাতায় তোমার খুব নিকট-আত্মীয় থাকেন নিশ্চয়ই, তাই বুঝি কথাটা বিশ্বাস করতে মন সরচে না?

বিভাস জবাব দিল, কলকাতায় বোমা পড়লে আর বাকী রইলো কি বলো তো? বাঙ্গলার তো তাহলে সবই গেল!

অত্যন্ত অর্থহীন অসংলগ্ন কথা! বিপিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার সব কথাই কেমন অদ্ভুত রকমের। শুন্‌চি, হাতিবাগানের ওখানে বোমা পড়ে অনেক ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েচে। কত যে মরেচে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিভাস চুপ করিয়া রহিল।

তা সত্যই, আশ্চর্যের কথা কি-ই বা আছে! ইউরোপের ধ্বংসলীলায় মেটারলিঙ্ক গিয়াছে, রোমাঁ-রোঁলা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, কলিকাতায় বোমা পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সবই হয়তো যাইবে, অথবা সত্যই গিয়াছে।

ঘরের দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে সে দৃষ্টি তুলিল। এরা সকলেই হয়তো যাইবে। এই বিশ্ববিনাশী মহাসমরে কেহই হয়তো অহুতি পড়িতে বাকী থাকিবে না। এবং এই মহাশ্মশানের ভগ্নস্তূপের উপর দিয়া যাহারা বিচরণ করিবে, তাহারা কোনোদিনই হয়তো ইহাদের চিনিবে না, কোনোদিন নামও হয়তো জানিবে না।

আবার রজনীর নিস্তব্ধ নির্জনতা!

বিভাস তাহার লেখার খাতা লইয়া বসিয়াছে। তাহার ডায়েরির পাতায় সে লিখিয়া চলিয়াছে,—"......সুতরাং এ-যুগের মহান্ সাধনা হইতেছে পৃথিবীকে বাঁচাইয়া রাখা তাহার আত্মবিস্মৃতির হাত হইতে। মানুষ মরিলেও পৃথিবী বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু যাহাদের জীবনের সঙ্গে ইহার বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা জড়িত রহিয়াছে, তাহাদের বাঁচাইয়া রাখাই এ যুগের চরম সাধনা। সেক্সপীয়র, গ্যেটে, মেটারলিঙ্ক, আইনষ্টাইনকে সমাধি দিয়া ইউরোপ কোনদিন বাঁচিতে পারিবে না, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষ কোনোদিন নিজেকে চিনিতে পারিবে না! অসম্ভব! এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার সংসারে আর কিছুই থাকিতে পারে না।"

লেখার ভিতরে চেতনাও বুঝি তার ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে হইল ঐসব বিগত মহাপুরুষদের সান্নিধ্যটুকু তার অনুভূতির গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দেওয়ালের রবীন্দ্রনাথের দিকে সে চোখ তুলিতে গেল, কিন্তু চোখে পড়িল আর এক মূর্তি। দুইটি দৃঢ়বদ্ধ অধরের উপর তর্জনী চাপিয়া তাহাকে স্তব্ধ হইতে ইঙ্গিত করিতেছে, একটি স্ত্রীমূর্তি! একখানি পাঁশুটে রঙের শাড়ী-পরা, মাথার চুলগুলি যেন একটু সযত্নে আলুথালু করিয়া এলো-খোঁপায় বাঁধা। চিনি-চিনি করিয়াও বিভাস তাহাকে চিনিতে পারে না। একি তবে তাহার সাধনার চেতনা-মূর্তি?

মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। মেয়েটা তাহার মুখে আঁচল চাপিয়া হাসিতেছে যেন! সে-হাসির যেন শেষ নাই। তার স্তম্ভিত নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে একটা ধূমায়িত শিখার মত সে জ্বলিতেছে যেন!

জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কে তুমি?

বাক্য কিন্তু বাহির হইল না। অন্ততঃ নিজের উচ্চারিত শব্দ তার নিজের কাণে প্রবেশ করিল না।

মেয়েটি একবার তাহার টেবলের উপর আলোকে আড়াল করিয়া বসিল। মুখখানা তার নজরে পড়িল না, কিন্তু তার দীর্ঘ ছায়াটা বিভাসের সমস্ত দেহের উপর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই ছায়ার ভিতর দিয়াও যেন তার দেহের সবটুকু উত্তাপ তার নিজের রক্তের ভিতর সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু তবু যেন তার নড়িবার চড়িবার এতটুকু শক্তি পর্যন্ত রহিল না।

এমনি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়াছিল, বলা শক্ত। হঠাৎ মেয়েটি উঠিয়া যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে লঘু অথচ দ্রুত পা ফেলিয়া সামনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেমনি স্তম্ভিতভাবে আরো খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর যেন বিভাসের চেতনা আসিল। বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

কোথাও কাহাকে দেখা যায় না। কৃষ্ণাষ্টমীর আধখানা চাঁদ সামনের শিরীষ গাছের ঝাঁকড়া মাথায় দোল খাইতেছে। কোনদিকে একটা শব্দ মাত্র নাই, না মানুষের পায়ের শব্দ, না বাতাসের শব্দ, না পাখীর ডানার শব্দ। সমস্ত প্রকৃতি মূর্ছিত—যেন কোন্ উপদেবতার শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে।

আবার সে ঘরের ভিতর নিজের জায়গাটাতে আসিয়া বসিল। নির্জন ঘরের ভিতর কার যেন পদচিহ্ন তার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মানুষের উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ যেন এখনো তার চারিপাশে সর্পিল গতিতে সঞ্চালিত হইয়া ফিরিতেছে।

ভাল করিয়া দরজাগুলি চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সে আবার তাহার খাতাকলম লইয়া বসিল।

পরের দিন সকালে।

বাঁধাঘাটের হেলিয়া-পড়া চাতালটার উপর দাঁড়াইয়া সে সামনের উঁচু জমিটার উপরকার সেই জীর্ণ কুটীরখানির পানে চাহিয়া ছিল। এতখানি বেলা হইয়া গেল, তবু কৈ, আজ তো সে মেয়েটা জল লইতে আসিল না!

অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকার পর দেখা গেল মেয়েটা কুটীর হইতে বাহির হইয়া মাটীতে কলসী নামাইয়া তুয়ারে শিকল তুলিয়া দিল। তারপর কলসী তুলিয়া লইয়া এই বাগানের দিকে আগাইয়া আসিল। বিভাসের বুকখানা আজ যেন তুরু তুরু করিয়া উঠিল। সে কাছে আসিলে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—কাল রাতে তুমিই কি এসেছিলে আমার ওখানে?

মেয়েটা একবার মুহূর্তের জন্য তার বিস্মিত দৃষ্টি তার মুখের উপর রাখিয়া তখনি নামাইয়া লইল। মনে হইল, তার তুটী অধর ছাপাইয়া একটা চোরা হাসির হিল্লোল খেলিয়া গেল।

মেয়েটা জল লইয়া উপরে উঠিলে আবার সে ঐ প্রশ্ন করিল। তবু কোন জবাব মিলিল না। যে ভিত্তিহীন ধারণাটা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেমন করিয়া কে জানে, সেটা যেন এখন নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। মনে-মনে বিভাস বলিল,—আশ্চর্য সাহস ঐ তুশ্চারিণীর! কেমন করিয়া ঐ গভীর রাত্রে সে তাহার ঘরে যাইতে সাহস করিল? আর কেনই বা গেল? এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, সে তাহাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিল না কেন? নিস্থতি রজনীর অবাস্তবতার মাঝখানে নিজের উন্মত্ত কল্পনার অবাস্তর প্রতিচ্ছবি বলিয়া নিজেই যেটাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, এখন, দিবসের পরিপূর্ণ বাস্তবতার মাঝে তাহা সত্যের গ্লানিতে তাহার অন্তর ভরিয়া দিতে লাগিল।

তার নির্জন সাধনার এম্‌নি করিয়া ঐ সর্বনাশী মেয়েটা বিঘ্ন ঘটাইবে নাকি?

আবার রাত্রি আসিল তার অন্ধকার আর নির্জনতার কালো আলখাল্লা গায়ে জড়াইয়া। বাহিরের দাওয়ায় একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বিভাস চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। আকাশের ঐ বিপুলতার পানে চাহিয়া-চাহিয়া নিজের উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা মনে হইতেছিল। বিরাট এই পৃথিবীর বিশাল জীবন-সমুদ্রের মাঝখানে তাহার নিজের জীবন বুঝি ঐ ক্ষুদ্রতম তারাটির চেয়েও ছোট, অথচ আকাঙ্ক্ষা তার কত বিরাট! সে চায় তার রশ্মি দিয়া ঐ সমস্ত আকাশখানা প্লাবিত করিয়া দিতে। হয়তো পৃথিবীর সকল মানুষই তাই চায়, কিন্তু ক'জন পারে ঐ মহাশূন্যের মাঝে এতটুকু একটু রশ্মিরেখা রাখিয়া যাইতে?

আজ আর লেখার সরঞ্জাম বা কেতাব লইয়া বসিতে একেবারেই তার মন উঠিতেছে না। ঘড়ি-বাজার শব্দগুলো প্রতিদিনের মত যেন তাহার অন্তরে একটা করিয়া গভীর ছেদ টানিয়া-দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে তার ইচ্ছা হইতেছে না।

হঠাৎ মনে পড়িল,—কাল প্রায় এম্‌নি সময় সেই মেয়েটা আসিয়াছিল না? আজও আসিতে পারে হয়তো। এবং যদি আসে, কি বলিবে সে আজ?

অত্যন্ত গ্লানির সহিত নিজেকেই সে নিজে প্রশ্ন করিল, তাহারই প্রতীক্ষায় সে আজ এম্‌নি নিষ্ক্রিয় হইয়া বাহিরে বসিয়া আছে নাকি? বিচিত্র কি! মনের নিদ্রিত দুষ্প্রবৃত্তি যে অত্যন্ত গোপনে কাজ করিতেছে না, সে কথা কে বলিতে পারে? এই যে অন্ধকার আর নির্জনতা, ইহার মধ্যে যত গভীরতা, কুটিলতাও তার চেয়ে কম নাই

তো! কুৎসিৎ সরীসৃপের মতো মানুষের অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কত গরলই না সে উদ্‌গীরণ করিতেছে!

ঢং! ঘড়িতে একটা বাজিল। দূরে—রেল-লাইনের উপর একটা ইঞ্জিনের শান্টিং-এর শব্দ শোনা গেল! তারপর সব নিস্তব্ধ। বাতাস পর্যন্ত আজ নিশ্চল। যেন এখনি ভয়াবহ একটা কিছু ঘটিবে, তাহারই জন্য সমস্ত প্রকৃতির এই থম্‌থমে ভাব।

বিভাস উঠিয়া ঘরের মধ্যে আসিল এবং দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল। তারপর একবার লেখার খাতাখানা আলোর সাম্‌নে মেলিয়া ধরিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। কিন্তু আজ আর লিখিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। ধীরে ধীরে আলোটা কমাইয়া দিয়া খাটিয়ায়-পাতা বিছানার উপর গা এলাইয়া দিল।

তন্দ্রাও হয়তো একটু আসিয়াছিল। হঠাৎ দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল বিভাস।

বিদ্যুতের শিখার মত যে কথাটা মনের একপ্রান্ত হইতে অপর-প্রান্ত চিরিয়া দিয়া গেল, তাহা এই : তবে কি সত্য-সত্যই সে আজও আসিল নাকি? কম্পিতবক্ষে দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু ঘরে ঢুকিল মেসেঞ্জার প্রাণকৃষ্ণ একখানা কাগজ হাতে লইয়া। বিভাস পড়িয়া দেখিল,—'মেসেজ্‌ ইয়োলো'। অর্থাৎ, জাপানী বোমারুরা যে-কোন মুহূর্তে এই এলাকায় হানা দিতে পারে, তারই সতর্কবাণী।

বিভাস মেসেঞ্জারকে বলিল,—আর কোনো কিছু খবর পেলি নাকি রে?

প্রাণকৃষ্ণ জবাব দিল,—আবার খবর কি বলচেন মাষ্টারবাবু? কল্‌কেতা এতক্ষণে উজোড় হ'য়ে গেল শুন্‌লুম। দলে দলে লোকেরা যেদিকে পারচে পালাচ্ছে। এদিকে—

রুদ্ধনিশ্বাসে বিভাস প্রশ্ন করিল,—কি রে?

—ওরা তো এদিকে আসাম পর্যন্ত ঠেলে এসেচে! এখানে আস্‌তে আর দেরি কি! দেখুন তো, আজ রাত্তিরের মধ্যেই কী হয়!

প্রাণকৃষ্ণ সাইকেলে চড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিভাস উঠিয়া নিষ্প্রভ আলোটার সাম্‌নে খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মত চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া রহিল। প্রতিক্ষণে তার মনে হইতে লাগিল, এখনি হয়তো সাইরেনের বাঁশীর শব্দ নিস্তব্ধ রজনীর বুক চিরিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। এবং তারপর—

মেসেঞ্জারের কথাগুলো বারংবার কাণে বাজিতে লাগিল—কল্‌কাতা এতক্ষণে উজোড় হ'য়ে গেল· · ···জাপানীরা যে আসামের ভিতরে ঢুকিয়াছে, এ-খবর তো জানাই। হয়তো এখান হইতে মাত্র একশো-দেড়শো মাইলের মধ্যেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং—

হঠাৎ একটা আতঙ্কে তাহার সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহা হইলে, সত্যসত্যই নিষ্কৃতির আর কোন উপায়ই রহিল না। কলিকাতার লোক দলে দলে পলাইতেছে। কিন্তু কোথায় পলাইবে? রেঙ্গুন হইতে পলাইয়া যাহারা কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছিল, আজ আবার কোন নিরাপদ স্থানে তাহাদের মাথা গুঁজিবার জায়গা মিলিবে? তবুও তাহাদের পলাইবার উপায় আছে, কিন্তু নিজের তার এতটুকুও নাই। এখানে—এই নির্জন অন্ধকার রাত্রির মাঝখানে বসিয়া সে একা—সম্পূর্ণ একা। সঙ্গী বলিতে এই লাইব্রেরী ঘরের বহুদিনের সঞ্চিত ঐ পুঁথির রাশি, আর তার নিজের আজীবন সাধনার এই হিজিবিজি-কাটা খাতাপত্র। অথচ, এরাই তো সব! সমস্ত পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবনের চেয়েও এদের মূল্য তার কাছে কতো বেশি! এবং সবচেয়ে পরমাত্মীয়—সবচেয়ে অন্তরঙ্গ তার—

আব্‌ছা আলোয় দেয়ালের দিকে চোখ তুলিয়া দৃষ্টি তার নিষ্পলক হইয়া গেল। এই যে—যাহারা তার নিজের জীবনের চেয়ে—

পৃথিবীর সব-কিছুর চেয়েও শ্রেয়—বাংলার সংস্কৃতি-সাধনার অগ্রদূত ঐসব মহামানবের দল, উহারাও তার সঙ্গে এই মৃত্যুযজ্ঞে আহুতি পড়িবে নাকি? তার নিজের এই নগণ্য জীবনের সঙ্গে সমাধিস্থ হইবে এই মহাজীবনগুলি?

হাত বাড়াইয়া সে আলোটা উস্কাইয়া দিল। ছবির প্রত্যেক মানুষটি তাহারই দিকে স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কী গভীর আক্ষেপ ঐ দৃষ্টিতে!

রাত্রি তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের বাঁশী শোনা গেল। নিসুতি রাত্রির বক্ষভেদ করিয়া সে কী করুণ আর্তধ্বনি! দিকে দিকে অলক্ষ্যে অসংখ্য নরনারী আর শিশুর শোণিতক্ষরণে পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল বুঝি! অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয়, সেই অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে শ্মশানের তাণ্ডবনৃত্য চলিয়াছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হইতেছে, দূরে ঐ মথিত গর্জন এবং তার সঙ্গে কাহাদের আর্তধ্বনি!

বিভাস একা। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে তার অদ্ভুত চিন্তাপ্রবাহের মাঝখানে অত্যন্ত নিঃসহায়ভাবে সে একা। দেওয়ালের প্রত্যেক ছবিটির পানে সে অত্যন্ত ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে। যা-হয় একটা কিছু করিবার জন্য তার অন্তর উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীতে তার নিজের বলিতে কোনো আকর্ষণ নাই, কাহারো এতটুকু স্নেহের বাণী তাহার মনে হিল্লোলিত হইয়া ওঠে না। মরিবার পক্ষে তার নিজের এতটুকু প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু ইহাদের সে বাঁচাইতে চায়। তার নিজের অতি তুচ্ছ জীবনের সঙ্গে ইহাদেরও সে মরিতে দিতে পারিবে না। অথচ, কেমন করিয়া বাঁচাইবে? একটা শোচনীয় নিষ্ক্রিয়তার গ্লানিতে বিভাস অস্থির হইয়া উঠিল।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার বাঁশী বাজিল নিরাপত্তার আশ্বাস-বাণী লইয়া। বিভাস স্তব্ধ হইয়া চেয়ারে বসিল।

বাঁশীর শব্দ করিতে করিতে তার সঙ্গী ওয়ার্ডেনরা হাজির হইল। একজন হাসিতে হাসিতে বলিল,—মাষ্টার যে ভয়ে একেবারে নীল হয়ে গেছ হে! এই তো তবু কলির সন্ধ্যে! আসলে আজ কিছুই হয়নি।

বিপিন বলিল—তার জন্যে আর দুঃখ কি? এরপর প্রত্যেক দিনই শ্যামের বাঁশী শুন্‌তে পাবে, দেখে নিও। সত্যিই তুমি ভয় পেয়েচ নাকি মাষ্টার? তোমার ম্যানুস্ক্রিপ্‌ট্‌গুলো যেন বেশ করে' আগ্‌লে থেকো হে।

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিভাসও মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

উন্মত্ত রজনীর পর প্রভাতের শান্ত অরুণিমা আবার দিকে দিকে হাসিয়া উঠিয়াছে। গত রজনীর সাইরেনের প্রতিক্রিয়ায় চারিদিকে চাঞ্চল্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাহারই ভিতর দিয়া আবার যে-যার দৈনন্দিন কাজ সারিয়া চলিয়াছে।

বিভাস আবার বাগানের ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আগের দিনের মত আজও দৃষ্টি তার নদীতীরের কুটিরটার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া এখন যেন হঠাৎ নূতন করিয়া মনে পড়িতেছে, কৈ, কাল রাত্রে তো মেয়েটা যায় নাই? মনে পড়িতেছে, কাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে চুপ্‌ করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল। হ্যাঁ, অনেকটা তাহারই প্রতীক্ষায় বলিতে হইবে বৈকি!

রাত্রি জাগরণে মথিত মস্তিষ্কের ভিতর কেমন যেন একটা একাগ্রতা জাগে। বিভাস সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই কুটিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মেয়েটাকে কুটিরের বাহিরে আসিতে দেখা গেল। খড়ের চালের উপর লাউ না কুমড়ার লতা উঠিয়াছে। মেয়েটা মই লাগাইয়া সেখানে উঠিয়া কি করিতেছিল। একটু পরেই নীচে

নামিয়া আসিয়া সে মইখানা সরাইয়া রাখিল ও ঘরের ভিতরে গেল।

একটা কথা হঠাৎ বিভাসের মাথায় বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে সে মেয়েটাকে কলসী লইয়া ঘাটের দিকে আসিতে দেখিয়া নিজেও ঘাটের আরো কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। এবং মেয়েটা কাছে আসিতেই বলিল,—আচ্ছা, দেখ, তোমার মইখানা আজ একবার আমার ঘরে পৌঁছে দিতে পার্‌বে?

মেয়েটা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—পার্‌বো।

বলিয়া সে প্রতিদিনের মত মাথা হেঁট করিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কিন্তু বিভাসের মন কেমন একটা গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। মেয়েটা হয়তো ঐ কথার ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আবিষ্কার করিতে পারে। অথচ, না বলিয়াই বা উপায় কি ছিল?

ঘরে ফিরিয়া নিজের মনে মনে সে বলিল,—সেদিন নিস্থতি রাত্রের সেই নারীমূর্তি যে ঐ মেয়েটা ছাড়া আর কিছুই নয়, ও কথা তাহার নিছক্ কল্পনামাত্র! জগতে নিত্য কত ব্যাপার কত আশ্চর্যভাবে ঘটিতেছে, সব-কিছুকে মানুষ তার স্থূল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে কৈ? আসলে সে ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, তার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কের অদ্ভুত খেয়াল মাত্র!

আশ্চর্য! তার জীবনের আগাগোড়াই একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ে ভরা। এ জীবনে ভালবাসা বলিয়া কোন বস্তু সে কাহারও কাছে পায় নাই, নারীর ভালবাসা তো নহেই। একদিন একজনকে সে চাহিয়াছিল তার মনপ্রাণ দিয়া, কিন্তু প্রতিদানে পাইয়াছিল শুধু অবজ্ঞা। সেই হইতে নারীকে সে চিরদিনই এড়াইয়া চলিয়াছে। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্থুরু হইল নাকি এতদিনে? নহিলে, সেদিনের

সেই অলৌকিক ঘটনাটা ঐ মেয়েটাকেই কেন্দ্র করিয়া এভাবে তার নিজের মনে ফেনাইয়া উঠিতেছে কেন? কেনই বা প্রত্যহ প্রাতে তাহার ঘাটে আসিবার সময়টিতে সে সেখানে না দাঁড়াইয়া পারে না?

বৈকালের দিকে বেড়াইয়া ফেরার পর বিভাস দেখিল, হলঘরের এককোণে সেই মইখানা পড়িয়া আছে।

সমস্ত দিনটা আজ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সন্ধ্যার সময় হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। প্রথমটায় ঝিম্‌ঝিমে বৃষ্টি সুরু হইয়া ক্রমশঃ বেশ জোরে নামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জানালার বাহিরের ঝাউগাছটাকে লইয়া বাতাসের মাতামাতির আর বিরাম নাই। বিভাস একটা মাত্র জানালা খোলা রাখিয়া অপর সব জানালা ও দরজা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

একে এই ঝড়ের রাত্রি, তার উপর সন্ধ্যার পূর্বেই 'ইয়োলা মেসেজ' আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিভাস ভাবিতেছিল,—আশ্চর্য, আজ এই ঝড়ের মাঝখানেও শত্রুর বিমান-হানার ব্যাঘাত ঘটিবে না নাকি? না-ঘটাই সম্ভব। উত্তর ইউরোপের প্রবল তুষারপাতেও এই সর্বনাশা মারণ-যজ্ঞের এতটুকু বিরতি নাই। সুতরাং এখানেই বা থাকিবে কেন?

ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল। বাহিরে ঝড়ের আস্ফালন ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বিভাস একা ঘরের মধ্যে নিতান্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। নিঃসঙ্গ রজনীর নির্জনতা তার মস্তিষ্কের ভিতর আবার অলৌকিকতার জাল বুনিতে সুরু করিয়াছিল। দেয়ালের সব ছবি ক'খানা যেন এই নির্জনতার সুযোগে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই যেন তারা তাদের মোটা ফ্রেমের বাঁধন এড়াইয়া তাহার চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাদের উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে মৌন কাতরোক্তি তার অন্তরের মাঝখানেও প্রলয়ের ঝড় তুলিয়াছে। বাহিরের মহাপ্রলয়ের সঙ্গে সে প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার বুঝি তুলনা হয় না।

কতক্ষণ এমনিভাবে কাটিয়াছিল, কোনো চেতনাই তার ছিল না। হঠাৎ সাইরেনের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া সে খোলা জানালাটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সাইরেনের শব্দকে ছাপাইয়া এরোপ্লেনের শব্দ তার কাণে আসিল। একসঙ্গে অনেকগুলো ইঞ্জিনের শব্দ নৈশ আকাশকে মথিত করিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণে তার লক্ষ্য হইল, বাহিরে ঝড়ের মাতন অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে এবং বৃষ্টিও বন্ধ হইয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে চারিটা ঘা পড়িল। মাথার উপর আবার একাধিক এরোপ্লেনের হুঙ্কার! বিভাসের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য সে নির্ভীকভাবে শক্ত এবং ঋজু হইয়া দাঁড়াইল। পর-মুহূর্তেই সে ছুটিয়া ঘরের কোণ হইতে মইখানা টানিয়া তুলিয়া দেয়ালে লাগাইল। এবং নিজে তাহার উপরে উঠিয়া এক একখানি করিয়া ছবিগুলিকে নীচে নামাইতে সুরু করিল।

সহসা দ্বারে ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কাতর-কণ্ঠের ডাক—বাবু, অ-বাবু!

নারীর কণ্ঠ! নিশ্চয় সেই মেয়েটা! কি আশ্চর্য সাহস এবং স্পর্ধা! এই নিশুতি রাত্রে কি ভরসায় সে এখানে আসিতে চায়?

বিভাস কোনো উত্তর করিল না।

আবার তেমনি করাঘাতের সঙ্গে তেমনি কাতর ডাক—অ-বাবু, বাবু গো!

অসম্ভব! এ সময় কি ছুতেই সে দরজা খুলিতে পারে না। প্রায় সব ছবি ক'খানাই সে নীচে নামাইয়া ফেলিয়াছে। এখনি ইহাদের নিরাপদ স্থানে রাখিতে না পারিলে কি যে ঘটিবে কে বলিতে পারে?

আরো কয়েকবার তেমনি করাঘাতের পর সব নিস্তব্ধ। বিভাস বুঝিল, মেয়েটা চলিয়া গিয়াছে। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

দূরে এবং নিকটে এরোপ্লেনের শব্দ ক্রমশঃ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে কোথায় কি ঘটিতেছে, কে বলিবে ?

বিভাস এক একখানি ছবি লইয়া সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, —উপরে যাইবার সিঁড়ির ঠিক নীচে আনিয়া জড়ো করিতে লাগিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু, তবু এতটুকু ক্লান্তি নাই, এতটুকু বিরাম নাই তার।

পূর্বাকাশে ভোরের আলো ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'অল-ক্লিয়ার' বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বিভাসের কর্তব্য ততক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরের দেয়ালের ছবিগুলি তখন সিঁড়ির নীচে আশ্রয় পাইয়াছে।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে কোথাও কেহ নাই। শুধু একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আর ধূসর আলো তাহার গায়ে-মুখে ঝাপটা দিয়া গেল। নিজেকে তার মনে হইল, এইমাত্র এক মহাসমাধি হইতে উঠিয়া আসিয়াছে বুঝি !

ওয়ার্ডেনের দল পোষ্টে আসিয়া জড়ো হইল।

বিপিন বলিল—কি হে মাষ্টার, বেঁচে আছো তো ?

বিভাসের মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না। যেন চিরদিনের জন্য সে তার বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

হরেন বলিল,—কাল্‌কের বাঁশী নিষ্ফল হয় নি। মাইল দুই দূরের গ্রামখানাতে এখনো আগুন জ্বল্‌চে।

দীপক বলিল,—আর তেম্‌নি কি ঝড়ের সৃষ্টি—কী ঝড়টাই হ'ল বলো দেখি। কত বড় বড় গাছ যে পড়েচে ! নদীর এপারে সেই যে নড়বড়ে কুঁড়েঘরখানা ছিল, সেটাও শুন্‌চি নদীর গর্ভে আশ্রয় পেয়েচে।

হরেন বলিল,—বলো কি ? কেউ চাপা পড়েনি তো ? ওখানে যে কারা থাক্‌তো শুনেচি ! দেখতে হ'লো তো !

বিপিন বলিল,—তোমার সখ হ'য়ে থাকে, যাও ভাই। আমি কিন্তু এখান থেকে আর নড়চি নে।

হরেন ও দীপক বাহির হইয়া গেল।

বিভাসকে উঠিয়া পিছনের দরজার দিকে যাইতে দেখিয়া বিপিন বলিল,—তুমিও চল্‌লে যে হে মাষ্টার?

বিভাস কোনো জবাব না দিয়া সোজা বাগানের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। নদীর ঘাট পর্যন্ত যাইতে হইল না। এখান হইতেই দেখা গেল, কুটীরটার চিহ্নমাত্র নাই বলিলেই চলে। শুধু সেই ঝাঁকড়া শেওড়া-গাছটা তেম্‌নি নির্বিকার ডাইনিবুড়ীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

বেলা তখন অনেকটুকু আগাইয়া গিয়াছে।

কতকগুলো লোকের মিশ্রিত কলরোলের মত একটা শব্দ বিভাসের কাণে আসিতে সে লাইব্রেরী-ঘরটাকে পাশে ফেলিয়া বাগান পার হইয়া ওদিকের সড়ক্ রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাস্তা দিয়া একটা জনস্রোত চলিয়াছে। যার যা-কিছু পার্থিব সম্বল, গরু-বাছুর-ছাগল, নারী এবং শিশুদের সঙ্গে করিয়া এরা চলিয়াছে শুধু চলার উত্তেজনাতেই,—কোথায় চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারো কোনো ধারণাই হয়তো নাই। বাঁচিয়া থাকিবার আদিম উন্মত্ত প্রেরণা এদের কোথায়—কোন্ নিরুদ্দেশের পথে লইয়া চলিয়াছে, কে বলিবে।

রাস্তার দুপাশে দর্শকের দল হাঁ করিয়া দেখিতেছে এই মনুষ্যপ্রবাহ।

বিভাসও দেখিতেছিল। কিন্তু সে দেখার মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেকখানি। তার সমস্ত দৃষ্টিশক্তির নীচে একটা ব্যাকুল নিষ্ফল সন্ধান অত্যন্ত একাগ্র ও মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছিল। ঐ সীমাহীন জনস্রোতের মাঝখানে সেই আশ্রয়প্রার্থিনী বিপন্না মেয়েটাকেও খুঁজিয়া পাওয়া হয়তো অসম্ভব হইবে না।

কিন্তু, কোথায় সে?